ত্রিপুরার উপজাতীয় আদিধর্ম, নৃত্যকলা ও দেবদেবী

সম্পাদনা

সুরেন দেববর্মন



জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
আগরতলা • ত্রিপুরা

TRIPURAR UPJATIYA ADIDHARMA, NRITYAKALA O DEVDEVI

By

Suren Debbarman

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারী 2000

প্রকাশক

দেবানন্দ দাস

জ্ঞান বিচিত্রা প্রেস

11 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা - 799 001

ফোন : (0381) 232 6342 / 232 3781

প্রচ্ছদ

অপরেশ পাল

মুদ্রক

গিরি প্রিন্ট সার্ভিস

91A বৈঠকখানা রোড, কলকাতা 700 009

কলকাতায় অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র

জ্ঞান বিচিত্রা

16 ডঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা - 700 009

ফোন : (033) 2360-4981

মা ও বাবা

রবিতি দেবী ও হরিমোহন দেববর্মার

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

সম্পাদকের কথা

সুপ্রাচীন ত্রিপুরা-ভূখণ্ডে সুদূর প্রাচীনকাল থেকে মঙ্গোল জনগোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারী বসবাস করে আসছে। এ সকল জনপদের প্রাচীনত্বের কাল নির্ণয় করা সুকঠিন। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন ইতিবৃত্তে যে আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আসাম প্রদেশের এক জনগোষ্ঠী প্রাচীনকালে ত্রিপুরার ভূমিতে অনুপ্রবেশ করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এ রাজ্যের রাজ্যশাসন ব্যবস্থার প্রচলন করে। এ সমস্ত কথা যদিও পৌরাণিক যুগের এবং ঐতিহাসিক যুগের পত্তনের বহুপূর্বে। উত্তর-পূর্ব ভারত ভূখণ্ডের সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠী মূলত বহির্দেশীয় — হাজার হাজার বছর আগে চীন ভূখণ্ড থেকে যথাক্রমে তিব্বত, ব্রহ্মদেশ অতিক্রম করে উত্তর-পূর্ব ভারত ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিল। আজকের সাত বোনের (আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশ) রাজ্য বাসীগণ ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত হলেও এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী হলেও এরা মূলত একই জনগোষ্ঠীভুক্ত যা ইংরেজিতে Mongoloid Stock বলা হয়।

এ সমস্ত জনগোষ্ঠীর নরনারীর আচরিত ধর্ম, পূজিত দেবদেবী, অনুসৃত নৃত্যকলা এবং পালিত পূজা পার্বণ উৎসব অনুষ্ঠানাদির বৈচিত্র্য আজও যাদুঘরের বস্তুনিচয়ের মতোই বৃহত্তর লোকসমাজের চোখে অনাবৃত। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় আঞ্চলিক সংস্কৃতির ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপকরণ — যা জাতীয় ইতিহাস — পরিকাঠামোর পরিপূরক। বর্তমানে এই ক্ষুদ্র রাজ্যে (পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদায় ভূষিত ১৯৭২ সনে) সর্বমোট ১৮টি ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী (Ethnic groups) বসবাস করে। এঁরা সবাই সংবিধান স্বীকৃত তফশিলি ভুক্ত উপজাতি (Scheduled tribes as per proviso of the Constitution)। এঁদের আদিধর্ম, নৃত্যকলা, দেবদেবী পূজাপার্বণ প্রভৃতি বিষয়াবলী সাধারণ পাঠক-গবেষকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত পঠন সামগ্রী হিসাবে পরিগণিত। এদের আদিধর্ম হয়তো বা একেবারে আদিমধর্ম (Primtive religion) ছিল — নিছক সর্বপ্রাণবাদ বা জড়বাদ। কিন্তু কালের গতিতে ভিন্ন দেশ ভিন্ন জনজাতির সংমিশ্রণে বিবর্তন বা পরিবর্তনের স্রোতধারায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তাই আজকের যুগে

কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ধর্ম সংস্কৃতির অবয়বে পুরোপরি আদি ধর্মের (Origin) পরিচয় খোঁজা বৃথা।

ত্রিপুরা রাজ্যবাসী তথাকথিত সকল আদিবাসী সমাজভুক্ত জনগোষ্ঠীর মূল ধর্ম সর্বপ্রাণবাদ বলে চিহ্নিত করা হলেও এদের মধ্যে কেউ হিন্দু, কেউ খ্রিস্টান কেউ বা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। ফলে এঁদের ধর্মীয় জীবনে মিশ্র ধর্ম-সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের কথাই ধরা যাকনা কেন। জাতিগতভাবে মূলত অ-আর্য এবং মঙ্গোল জাতিগোষ্ঠীর জনগোষ্ঠী — কিন্তু এদের ধর্মাচরণ - আর্য-সুলভ। স্বকীয় দেবদেবী পূজাপার্বণের পাশাপাশি আর্য-আচরিত দেবদেবী পূজাপার্বণে দৃঢ় বিশ্বাস এবং আদিম ধর্মবিশ্বাস ব্যতিরেকে সনাতন হিন্দুধর্ম অনুসরণ ত্রিপুরীদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে অ-আর্য ও আর্য এই দ্বৈত ধর্মধারায় পুষ্ট করে তুলেছে। একদিকে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ভক্তিপ্রবণ — অপরদিকে আদি দেবদেবীর প্রতি নিষ্ঠা এই দ্বিবিধ ধর্মবিশ্বাস তাদের করেছে মিশ্র ধর্ম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। যদিও শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জীবনযাত্রায় (শহরকেন্দ্রিক) আদিধর্মাচরণ — ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ছে — তবু গিরিকুঞ্জবাসী বৃহত্তর ত্রিপুরী সমাজ আজো আদি ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান। অনুরূপভাবে যেসমস্ত সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী খ্রিস্টান বা বৌদ্ধধর্মে রূপান্তরিত (মগ ও চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী আবার লুসাই কুকি প্রভৃতি খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী বা আস্থাশীল) হলেও তাদের আদিধর্ম আজো পালিত হয়ে থাকে। এই সম্পাদিত গ্রন্থে সে সবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণিত হয়েছে।

পরিশেষে সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনের কর্ণধার আমার অনুজপ্রতিম শ্রীমান দেবানন্দ দামকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ রাজ্যের গবেষণামূলক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে শ্রীদামের আগ্রহ এবং অগ্রগামিতা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে।

সুরেন দেববর্মন

সূচিপত্র

১. আদিবাসী সমাজ ও ধর্মের উৎস সন্ধানে ❖ অলিন্দলাল ত্রিপুরা ১১

২. ত্রিপুরা সমাজে আচরিত গড়িয়া পূজা ❖ সুরেন দেববর্মন ১৮

৩. গড়িয়া দেবতা ঃ ধর্ম-সংস্কৃতি ও কৃষির দেবতা ❖ দশরথ দেব...... ২৫

৪. কৃষিকেন্দ্রিক মানব-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ❖ সুরেন দেববর্মন ৩০

৫. সমন্বয়ের দেবতা গড়িয়া ❖ মনোরঞ্জন মজুমদার ৩৩

৬. জীবন ও জীবিকার প্রতীক গড়িয়া সংস্কৃতি ❖ দীপক ভট্টাচার্য...... ৩৭

৭. কালিয়া গড়িয়া পূজার উৎস-সন্ধানে ❖ জগদীশ গণচৌধুরী ৪০

৮. গড়িয়া পূজা ও বাংলা নববর্ষ ❖ মহেন্দ্র দেববর্মন ৪৩

৯. সমাজ বিবর্তনের আলোকে গড়িয়া সংস্কৃতি ❖ সুরেন দেববর্মন ৪৭

১০. ত্রিপুরা আদিবাসীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও তান্ত্রিক চিকিৎসা
❖ অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা ৫০

১১. মন্ত্রতন্ত্র ও যাদুবিদ্যা ❖ অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা.................................. ৫৭

১২. ত্রিপুরীদের নৃত্য ❖ সুরেন দেববর্মন ৬৪

১৩. জমাতিয়াদের ধর্ম ও পূজা পার্বণ ❖ সুরেন দেববর্মন ৭৪

১৪. রিয়াংদের দেব-দেবী ও নৃত্য ❖ সুরেন দেববর্মন ৭৭

১৫. চাকমাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও দেবদেবী ❖ সুরেন দেববর্মন................. ৮৪

১৬. গারোদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৃত্য কলা ❖ সুরেন দেববর্মন ৯২

১৭. মগদের ধর্মীয় উৎসব ❖ সুরেন দেববর্মন.. .... ৯৮

১৮. মগনৃত্য ❖ সুরেন দেববর্মন.. ... . ১০০

১৯. হালামদের ধর্ম, পূজা পার্বণ ও নৃত্য ❖ সুরেন দেববর্মন ১০১

২০. লুসাইদের ধর্মীয় বিশ্বাস ❖ সুরেন দেববর্মন ১০৪

২১. লুসাই নৃত্য ❖ সুরেন দেববর্মন ১০৬

২২. উচইদের পূজাপার্বণ ❖ সুরেন দেববর্মন ১০৮

২৩. ত্রিপুরার আদিবাসীদের পূজিত দেবদেবী ❖ জগদীশ গণচৌধুরী . ১১১

২৪. পরিশিষ্ট ১১৬

প্রকাশকের কথা

ক্ষুদ্ররাজ্য ত্রিপুরায় বহু ধর্ম বহু জাতি ও উপজাতির বাসভূমি। এঁদের কৃষ্টি, ধর্ম, পূজাপার্বণ বৈচিত্র্যময়। বর্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থে স্থানীয় বিভিন্ন অধিবাসীদের দেবদেবী পূজাপার্বণ নৃত্যকলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপিত করা হয়েছে। সুধী পাঠকবৃন্দের দরবারে স্থানীয় জনগণের ধর্মাচরণের দিকটি পরিবেশন করাই বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

দেবানন্দ দাম

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

দশরথ দেব

মহেন্দ্র দেববর্মা

অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা

দীপক ভট্টাচার্য

মনোরঞ্জন মজুমদার

জগদীশ গণচৌধুরী

আদিবাসী সমাজ ও ধর্মের উৎস সন্ধানে

অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা

যেসব জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর যে যে অংশে আদিকাল থেকে উৎপন্ন হয়ে সেইসব স্থানে বসবাস শুরু করেছিল এবং প্রকৃতি ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল, অনগ্রসর ঐসব জনগোষ্ঠীকেই আদিবাসী বলে। পৃথিবীর সর্বত্রই আদিবাসী নামে অনুন্নত মানবগোষ্ঠী বাস করে। ভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এশিয়া মহাদেশে মঙ্গোলীয় জাতির লোকজনই অধিক। আদিবাসী জনগণ নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। নেপাল, ভুটান, সিকিম ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যে হিমালয় পর্বতের শাখা প্রশাখার পর্বত শ্রেণীতে প্রচুর পার্বত্য জাতি বাস করে। ত্রিপুরা রাজ্য এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলের জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণ। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এই অঞ্চলে খুব বেশি। এইসব কারণে এই অঞ্চলে গাছপালা অল্প সময়ে বৃদ্ধি পায় ও গভীর বনাঞ্চল দেখা যায়। আদিবাসীগণ বনজ সম্পদে নির্ভরশীল বলে শিল্প বাণিজ্যে অনগ্রসর। ষাট বছর পূর্বেও জনবসতি বিরল ছিল, যানবাহনের উপযুক্ত স্থায়ী রাস্তাঘাট ছিল না। হাতি ও ছোট নৌকা পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতি অল্প ছিল, তাই ত্রিপুরার পার্বত্য জনসমাজে শিক্ষার প্রসার ছিল অতি নগণ্য। তবু জনগণ অশিক্ষিত ছিল না। প্রধান জীবিকা জুমকে কেন্দ্র করে নাচ-গান, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, সামাজিক ও মানবিকতার সকল গুণ ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটেছিল। রূপকথা, উপকথা, সামাজিক জীবনযাত্রার শৃঙ্খলাবোধে নিহিত ছিল তাঁদের শিক্ষার সোপান। গভীর পর্বতের স্থানে স্থানে পার্বত্য পল্লি। আত্মরক্ষার সুবিধার্থে বা সামাজিক কারণে দশ পাঁচ পরিবার একত্রে বসবাস করে। ঐসব গ্রাম পঞ্চাশ ষাট বছরও স্থায়ী হয়। যার যার সুবিধা অনুযায়ী পাশাপাশি বা দূরে দূরে ছড়িয়ে জুম চাষ করে। জুম মরশুম বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস। এই সময় তারা জুমে বাস করে ও জুমের কাজে ব্যস্ত থাকে। ধান মাড়িয়ে ঘরে তোলা হলে টং ঘরে গোলাজাত করা হয়। ফসল গোলাজাত করার পর সমস্ত ধান লাঙ্গাতে করে পিঠে বহন করে পূর্ব বাসস্থান পল্লিতে নিয়ে আসা হয়। তখন ছয় মাস ঘর ছেড়ে জুমে বাস করাতে গ্রামের বাঁশ ও ছনের তৈরি কুটির প্রায় নষ্ট হয়ে যায়, সেই কুটির আবার মেরামত করতে হয়। অবশ্য বনে প্রচুর

ছন, বাঁশ গাছ থাকাতে বিনামূল্যে কুটির নির্মাণের উপাদান সংগ্রহ করা সহজ। অতি অল্প সময়ে নতুন কুটির নির্মাণ বা পুরোনো কুটির মেরামত করে নেয়। বনে ফলমূল, কন্দ, লতাপাতা, শাকসবজি সংগ্রহ করে টাটকা ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণযুক্ত আহার্য সংগৃহীত হয়। জুমের চাল, শাকসবজি, মশলা, তামাক, নানা রকম ফল যা উৎপন্ন হয় তাতে প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদা মিটে যায়। প্রয়োজনীয় আসবাব ও সাজসরঞ্জাম বনজ বাঁশ ও গাছ থেকে তৈরি করা হয়। বেতের নানা রকম ফসলাধার হাতে বোনা হয়। লাঙ্গা, মাদুর, হাত পাখা, কাপড় চোপড় রাখার জাবা, নখাই, চেমাই, খুক্রুক, কচা য়াংখুং ইত্যাদি বাঁশ বেতের প্রয়োজনীয় আসবাব ও বাঁশের বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হয়। যেমন, বাঁশের শিঙ্গা, দংদ্রংমা, দাংদু ইত্যাদি। বাঁশের চিরুনিতে উত্তমভাবে চুল আচড়ান যায়। জুমের তিল থেকে প্রস্তুত করা হয় তেল। হলুদ, আদা, লঙ্কা, জুইন ও মশলা জাতীয় সুগন্ধ উদ্ভিদ তরকারিতে মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বনের গাছ গাছড়ার শিকড় ও চালের পিষ্টক মিশিয়ে ভাত পচানোর জন্যে ঔষধ 'চুওয়ান' তৈরি করা হয়। চুওয়ান লাগে মদ বানাতে। গ্রামের কর্মক্ষম স্ত্রী পুরুষ দলবদ্ধভাবে একে অন্যের জুমখেতে পাল্টাপাল্টিভাবে কাজ করে। একজনের জুমের পর অন্যের জুমে তারা কাজ করে যায় ক্রমান্বয়ে। আজ এক ব্যক্তির কাজ করে, পরদিন দলবদ্ধভাবে অন্য ব্যক্তির জুমে কাজ করে। মদ পান করে নেচে গেয়ে চিত্ত বিনোদন সহ তারা কাজ করে। এরূপ পরস্পর সহযোগিতা ও সাহচর্যে ভুলে যায় শ্রমের ক্লান্তি। আনন্দঘন রসে কর্মচঞ্চল মুহূর্ত অতিবাহিত করে। দলবদ্ধ জনতা হিংস্র পশুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সাহস পায়। অসংখ্য পর্বতের আড়ালে, গভীর বনের কোলে, জুম ও জুমিয়া জীবন কাটে সহজ সরল অনাড়ম্বর পরিবেশে। কি জুমে কি পল্লিতে তৈরি করা হয় বাসপোযোগী 'টংঘর'। টংঘর পর্বত চূড়ার সমতলে পর্বতের সমান্তরাল প্রস্থ থেকে দৈর্ঘের পরিমাণ তিনগুণ-চারগুণ করে মাচা বেঁধে মাটি থেকে বেশ উপরে তরজার মেঝে তৈরি করা হয়। মজবুত বেড়া মেঝের চারিদিকে থাকে। প্রস্থের উভয় দিকে থাকে বারান্দা, বারান্দার শেষ প্রান্তে বিছানা থাকে সুদীর্ঘ একটা মাঝারি বা বড় আকারের গাছ। ঐ কাষ্ঠ কাণ্ডে ঠেস দেওয়া ওঠা নামার 'য়াখিলি' বা সিঁড়ি রাখা হয়। ঐ মাচা ঘর একটি মাত্র বিরাট প্রকোষ্ঠ। এক পাশে থাকে এক বিরাট মাটি বিছানা রান্নার চুল্লি। যেখানে সর্বদা আগুন রাখা হয়। বাড়ির উপরে পিছনের দিকে রাতে পায়খানা - প্রস্রাবের ব্যবস্থা থাকে। হিংস্র জন্তুর ভয়ে এই উচ্চ মাচা ঘর, ও এইসব ব্যবস্থা! পর্বতবাসী জনগণকে সর্বদা পাহাড়ে ওঠা-নামা করতে হয়। তাই

তাদের পায়ের মাংসপেশী মাংসল ও মজবুত। উঁচু নিচু ওঠানামার সুবিধার জন্য মাথায় দড়ি লাগিয়ে লাংগ্গা পিঠে রেখে মাল বহন করে।

কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটা ও মাড়া হলে প্রায় সব জুমিয়া পরিবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরে আসে। তখন জুম থাকে নিঃশব্দ-নির্জন। হিমেল হাওয়া, মৃদুমন্দ শীতল বায়ু বাঁশবনের মাথা নেড়ে দিয়ে যায়। নীলাকাশে হাল্কা মেঘ। অপূর্ব এক পরিবেশে ঘটে শীতের সূচনা। জুমের আশে পাশে, বৃক্ষের উচ্চ শাখা-প্রশাখায় বানরগুলো অলসভাবে বসে লেজ ঝুলিয়ে বাতাসে দুলতে থাকে। পাখির কলরবও শোনা যায় না। তখন পাতাগুলো প্রায় বিবর্ণ। যেন শীতের ভয়ে আকুল ও পাতাঝরা উৎসবের আয়োজনে ম্লান ও বিমর্ষ।

এই দেশে স্থায়ী রাস্তা ছিলনা। দুই পাহাড়ের মাঝখানের খাদ দিয়ে ছোটো ছোটো ঝরনা ঝির ঝির করে প্রবাহিত হতে হতে অপেক্ষাকৃত বড় নদীতে গিয়ে মিশে যায়। এরূপে পর পর ক্রমশ জলধারা বাড়তে বাড়তে সৃষ্টি হয় বড় নদীর। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য জলকুণ্ড। একটি ঝরনার উজান বেয়ে যেতে যেতে উৎসস্থলে পৌছা যায়। বিভিন্ন ছড়া বা নদনদী ধরে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পৌছান যায়। যেদিকে জুম সেদিকেই পথ। বনপথ খুবই সংকীর্ণ। স্রোতস্বিনীর উজানে বা নিম্নে চলতে থাকলে অসংখ্য ছোটো ছোটো বিক্ষিপ্ত নুড়ি ও প্রস্তরখণ্ড দেখা যায়। প্রস্তরখণ্ডের পর প্রস্তরখণ্ড। অগণিত উলখণ্ড। কোনটি হলুদ কোনটি লাল। পিচ্ছিল প্রস্তরখণ্ডের পর প্রস্তরখণ্ড পার হয়ে একগ্রামের লোক অন্যগ্রামের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকে। ছোট ছড়ার উভয় পাড়ে ঘন বৃক্ষের বন। কোথাও গভীর ও নিবিড় বৃক্ষের বন। কোথাও বাঁশবন। দুই পর্বতের মধ্যভাগে পাতার ছাউনির নিচে কুলুকুলু ধ্বনিতে প্রবাহিত হয় স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী। এর উভয় পাড় ঢালু। কোথাও দেওয়ালের মত পাষণ প্রাচীর। শাল, গর্জন, অশোক গাছ সারিসারি দণ্ডায়মান। রুদ্রাক্ষ ফল ঝরে হাঁটু জলে প্রচুর পরিমাণে ডুবে থাকে। বৃক্ষ শাখায় নানা রঙের, নানা আকারের ফল। এই পাড়ের বৃক্ষশাখা ঐ পাড়ের বৃক্ষশাখার সাথে মিলে মিশে উভয় পারে বৃক্ষশাখার পাতায় পাতায় উপরিভাগ ছাউনি দিয়ে আবৃত, আকাশ দেখা যায় না। প্রখর রৌদ্র সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। ঝবনার উভয় পাড়ে বৃক্ষে বৃক্ষে শাখায় শাখায় কত রঙের ফল। কোন কোন ফল কাঠবিড়ালি ও পাখি খায়, কোন কোন ফল কোন প্রাণী খায় না। এই ঘন বন ছায়া শীতল ও নির্জন। নির্জন হলেও নীরব নয়। ফল ফুল লতাপাতার ঝোপঝাড় অপরূপ শোভায় শোভিত। কীটপতঙ্গের একটানা বিচিত্র সুরে বন

মুখরিত। বৃক্ষে বৃক্ষান্তরে বানর লাফালাফি করে। কোন বৃক্ষ ডালে কাঠবিড়ালি পিছনে লেজ উঁচু করে দু-হাতে ফল খায়। উল্লুকের ডাক মানুষের চিৎকারের মত শোনা যায়। ছোটো পার্বত্যনদীর উভয় পারে ছোট ছোট তৃণগুল্মের ঘন বন। ঐসব তৃণগুল্মই রোগের ঔষধ রূপে ব্যবহৃত।

কোন কোন স্থানে ঝরনার ধারা উঁচুস্থান থেকে নিচে পড়ে সৃষ্টি করে জলপ্রপাত।প্রখর রৌদ্রে এই গভীর বনের ভিতর দিয়ে ছোট নদীর পথ ধরে ছায়ায় ছায়ায় পথ চলা আরামদায়ক। ছোট বড় কালো পাথরের খণ্ডগুলোর ফাঁকে চলে ঝরনা ধারার লুকোচুরি খেলা। নির্জন অরণ্যের এই কুলকুল ধ্বনি যেন এক র্মমস্পর্শী ভাষা।

এই ঝরনায় এক পশলা বৃষ্টি হলে কাঁকড়ার দল, ঝাঁকে ঝাঁকে আহারের সন্ধানে প্রকাশ্য দিবালোকে পাথরের নিচের বাসস্থান ছেড়ে বেরিয়ে আসে। কত ধরা যায়। কাঁকড়ার দাঁড়ার শাঁস অতি সুস্বাদু। পাথরের তলে ঝরনার অগভীর জলে ছোট বড়শি ফেলা মাত্র মাছ সজোরে টেনে নিয়ে বড়শির ছিপে উঠে আসে। পাহাড়ি নদীতে মাছ ধরা বড়ই মজার।

নদীর উভয় তীরে কোথাও বনজ কলার বন, নিচে মাটি ধসে লাল মাটি দেখা যাচ্ছে, ঊর্ধ্বে গগনস্পর্শী পর্বত চূড়ায় সারিসারি বনস্পতি। বৃক্ষ সমূহ নিথর নিঝুম মৌন অবস্থায় দণ্ডায়মান। বিস্তীর্ণ বনময় অঞ্চল। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম কোথাও প্রায় পাঁচ মাইল, কোথাও প্রায় দশ মাইলের ব্যবধান। ঐসব অসংখ্য পর্বত গাত্রের ফাঁকে ফাঁকে রোমশ চামড়ার বিছানার মত দেখা যায় সবুজ জুম। ঐ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জন মানবের কোন সাড়া শব্দ নেই। কে বলে জুমিয়ারা ভূমিহীন। সাতমুড়া, সাতছড়া বিস্তীর্ণ এলাকা তাদের বিচরণ ক্ষেত্র। গাছ, বাঁশ যত ইচ্ছা কেটে এনে গৃহ নির্মাণ বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায়। চুরি করেছেও বলে না। ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা স্থাপিত হলে অভাবের কারণে শুরু হয় চুরি। ঘন বসতিপূর্ণ শহরে নিজের মালিকানার সীমার বাইরে লতাপাতা, ফুল, ফল, আহরণ করলেই চোর বলে গণ্য করা হয়।

জল যেরূপ সুলভ, মাটিও সেরূপ সুলভ। বসবাসের জন্য মাটি কেনা একজন জুমিয়ার কাজে বিস্ময়ের ব্যাপার ও কল্পনাতীত। কারণ জন্মগত অধিকার হিসাবে পুরুষানুক্রমে জুমিয়া বায়ু, জল, সূর্যালোক, মাটি ও বনজ ফলমূল বিনামূল্যে প্রকৃতির দান হিসাবে পেয়ে এসেছে। চারিদিকে সবুজ বনানী। সেখানে জুমিয়া

দম্পতি মুক্ত বিহঙ্গের মত বিচরণ করে। সে এক অনাড়ম্বর সরলতাপূর্ণ স্বর্গীয় জীবনপ্রণালী। মিথ্যা - প্রবঞ্চনা, ছল - চাতুরি দেনা - পাওনার তীব্র হিসাব নিকাশ এখানে অচল। তাদের প্রাণ উদার, শান্ত, সরল ও মধুময়। এরূপ পরিবেশে জুমিয়ার প্রাণ মুক্ত বিহঙ্গের মতো অসীম আকাশ-তলে বিনা বাধায় স্বচ্ছন্দে, বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করে। সীমাবদ্ধ ও গন্ডিবদ্ধ নিয়মানুবর্তী জীবন যাপনে জুমিয়া অনভ্যস্ত। তাই জুমিয়ারা পুনর্বাসনের মাধ্যমে গৃহীত প্রকল্পাদির প্রদত্ত, নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ স্থানকে পিঞ্জরাবদ্ধ মনে করে। শুধু আর্থিক অনুদান যথেষ্ট নয়। শিক্ষার মাধ্যমে তাদের রুচি ও মানসিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ভাবা উচিত। সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিশুকে, শৈশব থেকে বর্তমান কালের উপযোগী শিক্ষাদানের মাধ্যমে রুচি ও প্রবৃত্তি গঠনে সহায়তা করতে হবে।

নদীই সভ্যতার জননী। যেকোন সভ্যতা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যেমন, সিন্ধু নদী তীরে সিন্ধু সভ্যতা ও ভারতীয় অন্যান্য নদীর তীরে বিশিষ্ট ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে। গাঙ্গেয় উপকূলবর্তী আদিবাসী জনগণ অধিকতর প্রাচুর্যে বসবাস করে। কিন্তু বন্ধুর পর্বত সঙ্কুল পার্বত্য প্রদেশে বা ঊষর মরুভূমিতেও যাযাবর জাতীয় লোক দেখা যায়। প্রকৃতিই সে জন্য দায়ী। প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূল অবস্থায় আনয়নের মাধ্যমে আধুনিক জীবনধারণের মানসিক তাগিদ এখনও জুমিয়াদের আসেনি। সমভূমি জুম চাষের অনুপযোগী তাই অত্যুচ্চ পর্বতে তারা বাস করে। অস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা বিধায় স্থায়ী রাস্তাঘাট, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি অর্থকরী বৃক্ষরোপণ করে না, যা উৎপাদিত হয়, তা পরিবহনেরও ব্যবস্থা নেই। গাড়ি, ঘোড়া, যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। আসামের বিস্তীর্ণ এলাকায় সুউচ্চ পর্বতমালা বিস্তৃত, সেখানে জুম প্রথা ছাড়া অন্য উপায় নেই। বর্তমানে টেরিসিং প্রথায় ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করা হলেও ঐ প্রথায় উৎপাদনের পদ্ধতি জানা লোক সংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট নয়। সম্ভাব্য কৃষিকার্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, পশু পালন, পশম উৎপাদন, বাঁশ বেত, বস্ত্র উৎপাদনই পার্বত্য জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নের উত্তম উপায়। বর্তমানে ঐসব দেশে এবং ত্রিপুরায় যতটুকু শিল্প বাণিজ্য ও আর্থিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে, নিজদেশে ঐ সব সম্ভাব্য ব্যবস্থা থেকে উপজাতীয় জনগণ কিন্তু দূরে সরে রয়েছে। চিরাচরিত প্রথায় জুম চাষ ও অন্যান্য ব্যবস্থায় তারা সুদূর অতীত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে এসেছে। ঐসব উপায় ও ব্যবস্থার উপযোগিতা ও সুবিধাও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, তাই উপজাতি জনগণ দিনের পর দিন নিঃস্ব নিঃসম্বল হয়ে পড়ছে। পার্বত্য জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ

আর্থিক ও রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক কৌশলের শিকার হয়ে পড়ছে। এই সব জনগোষ্ঠীর আর্থিক আনুকূল্যের উপায়, শ্রমশক্তি অবহেলিত ও নিম্ন মানের মর্যাদায় পর্যবসিত। এইসব অপকৌশলের ফাঁদে পড়ার কারণ অশিক্ষা, সরলতা এবং মানসিক চেতনার অভাব, বংশগত ও সামাজিক সংস্কার রুচি ও অভ্যাসই দায়ী। বর্তমানে মানুষ আধুনিক সভ্যতার প্রকৌশলে ও জীবনধারণের ক্ষেত্রে বহু দূর অগ্রসর হয়েছে। সেই নিবিড় অরণ্য, জনসংখ্যার অল্পতা, বনজ সম্পদের প্রাচুর্য, সিংহ, ব্যাঘ্র, হিংস্র বন্যজন্তুর ভয়ভীতি, সরলতার স্থান ও সময় বর্তমানে আর নেই। জগত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের সংগে আচার অনুষ্ঠান, পূজা-অর্চনা, পেশা, মানসিকতা, রুচি-প্রবৃত্তি সবকিছুই কালের সঙ্গে সঙ্গতি ও সংহতি রেখে ব্যক্তি বা জাতির মানসিক রুচিকে গঠন করে নিতে হবে। সুতীব্র ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রয়োজনীয় কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে বর্তমানের সঙ্গে সমতালে চলতে হবে -- তবেই আর্থিক সামাজিক অবস্থার কালোপযোগী পরিবর্তন ঘটবে। সততা, সরলতা, প্রেম, লজ্জা, ঘৃণা, উদারতা প্রভৃতি মানসিক গুণাবলী মনুষ্যত্বের উপাদান। মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ও মানবসুলভ আচরণই ধর্মের সোপান। হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি নিজেকে ও অন্যাকে নিম্নস্তরে, ঘোর দুঃখ-দুর্দশায় অবনমিত করে। সুতরাং মানসিক উৎকর্ষ ও গুণাবলী সহ সকলের বাঞ্ছিত কর্ম আচরণে চিরস্থায়ী পেশা নির্বাচন করতে হবে। অন্যের দুঃখদায়ক কর্ম ও আচরণে উপার্জনের প্রচেষ্টা, পাপ পথে, ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। সুতরাং কালের বিবর্তনে পূর্বে উল্লেখিত দেবদেবীর কিছু পূজা অর্চনার প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিকভাবে বর্জিত হয়ে এসেছে। কারণ অতীতের সেই গভীর বন আর নেই, হিংস্র পশুর উপদ্রবও আর নেই। সেই সব পূজাই বর্তমানে টিকে যাচ্ছে স্বাভাবিক ও যৌক্তিকতার কারণেই। উপযুক্ত। পরিবেশ ও মানসিক পরিবর্তনে ও কালের ব্যবধানে কোন কোন দুর্বল দেবতার দেবত্ব খসে পড়তে বাধ্য। বর্তমানে অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে ঔষধাদি সেবনে রোগ, নিরাময় বা আরোগ্য হলে, ব্যয়সাপেক্ষ পূজাদি বর্জিত হতে বাধ্য। তাতে অপসংস্কৃতি দূরীভূত হবে এবং তাতে সংস্কৃতির অঙ্গহানি। বরঞ্চ উচ্চ সংস্কৃতি গ্রহণে ও ধর্মের আশ্রয়ে উন্নততর হবে।

বহু দেবদেবী পূজার প্রয়োজনীয়তা আছে। পূজার মাধ্যমে পার্বণ, পার্বণের মাধ্যমে উৎসব, আনন্দ ও জনসংযোগ হয় এবং পারস্পরিক মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। চিত্ত বিনোদন সুপ্রবৃত্তি জাগরণের সহায়ক হয়। শুধু রোগ নিরাময়ের প্রয়োজনে, লোক চক্ষুর অন্তরালে অল্প সংখ্যক লোক বনে, উপবনে যে সব দেবতার পূজা

করে সন্তোষ সাধনে, ব্যক্তি বিশেষের রোগমুক্তির কামনায়, নিভৃত কুঞ্জে পানাহার করছে — সেসব দেবদেবী ও পূজারী উভয়েই স্বার্থপর। স্বার্থপরতা দেবত্ব নহে বরঞ্চ নীচতার লক্ষণ। সেজন্য কুলদেবতা সর্ব দেবদেবীর অধীশ্বর একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক ও নির্দিষ্ট কালে সমবেত প্রার্থনার ব্যবস্থা করা উচিত হত পারস্পরিক মিলনে প্রেম-প্রীতি, উন্নত মানসিকতা, উদারতা, বদান্যতা সকল মানসিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটবে। হিংসা, জিঘাংসা, ভুল বোঝাবুঝির মাত্রা কমে যাবে। সাধু সঙ্গ, সৎ আচরণে সদ্ মানসিকতা গড়ে উঠবে ও সৎ পেশা অবলম্বনে সৎপথের সন্ধান মিলবে। যে ধর্মাচরণ যে নীতি ইহকালে কল্যাণকর নয়, তা কোন কালে উপকারী হতে পারে না। ঐহিক মঙ্গলজনক আচরণই পরকালের পাথেয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুদ্ধিবলে করণীয় ও আচরণীয় পথ হিসাবে বৌদ্ধমত গ্রহণ করতে পারে। নির্বোধ ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াই একমাত্র পথ ও অবলম্বন। অতএব মহেশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে মন্দিরে সমবেত প্রার্থনা ও ধর্মালোচনা করাই মানসিক সদ্‌গুণাবলী জাগরণে ও কুসংস্কার বর্জনের একমাত্র পথ। মনের ধীরতা, স্থিরতা সংস্কারের মাধ্যমে সাধিত না হলে কোন মঙ্গলজনক কর্মে দৃঢ়তা ও গভীরতা আসে না। সৎ পেশায়, সৎকর্মে উপযোগিতা অর্জিত হবে না। সুতরাং সৎ মানুষ প্রস্তুত করাই শিক্ষার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। সুশিক্ষায় শিক্ষিত মন, আদিম বন্য প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে বর্তমান ভাব ধারায় মিলিত হতে পারে। এইসব সংস্কার ও কর্ম, পূর্বপুরুষের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক্রমোন্নত আদর্শের দিকে সম্প্রসারিত করে উদ্দেশ্যমুখী কর্মধারা সম্পাদন করতে হবে। অন্যের প্রভাব মুক্ত হতে হবে। তবেই বিশুদ্ধ সমাজ সংস্কারের পথ নির্বাচিত হবে ও অত্যুচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করবে। প্রকৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া নয়, প্রকৃতির পরিবেশকে আমাদের সমাজের উপযোগী করতে হবে। খল লোক সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর। দুষ্ট লোককে সহসা সৎপথে আনা যায়না। কারণ মানুষের মানসিক গুণাবলী ও প্রবৃত্তি বংশগত ও জন্মগত। জন্মগত প্রবৃত্তিই সহজাত প্রবৃত্তিই মানুষকে প্রতিভার অধিকারী করে। আবার অহিত কর্মের দক্ষতার অধিকারী করে। সুতরাং সৎ ব্যক্তির সংখ্যা হতে অজ্ঞ নির্বোধ অহিতকারী স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতির আয়াসলব্ধ শক্তিতে বেড়ে ওঠে। এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক। সুতরাং একজন উত্তম ব্যক্তি, বহু অধম ব্যক্তির দ্বারা সৎকর্মে বাধা প্রাপ্ত হয়। বাধা অতিক্রম করাই মহত্ত্ব। যা সমাজে সংস্কারের পাথেয়।

ত্রিপুরা সমাজে আচরিত গড়িয়া পূজা

সুরেন দেববর্মন

বাঙালি হিন্দু সমাজের ধর্মীয় জীবনে আচরিত পূজাপার্বণের মতই ত্রিপুরী সমাজের ধর্মীয় জীবনে বিবিধ পূজাপার্বণ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাংলার সার্বজনীন দুর্গোৎসব, চড়ক পূজা, উত্তর ভারতের দশেরা, আসামের বিহু, পশ্চিম ভারতের সমুদ্রপূজা, দক্ষিণ ভারতের কেরলে শ্রাবণ পূর্ণিমা উপলক্ষে 'ওনম' নামক প্রসিদ্ধ নবান্ন উৎসবের সমতুল বাংলার নববর্ষে অনুষ্ঠিত গড়িয়া পূজা ত্রিপুরার অধিকাংশ উপজাতিদের পালিত এক মহান ও ঐতিহ্যমণ্ডিত সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব। গড়িয়া পূজা ত্রিপুরী ছাড়াও জমাতিয়া, রিয়াং প্রভৃতি হিন্দুধর্মাবলম্বী উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত। পূজার আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও পূজার উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। গড়িয়া দেবতা সকলের পরম আরাধ্য। পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি, শক্তি, ভোগ-বিলাসের জন্য তাঁর আশীর্বাদ একান্ত প্রার্থনীয়। তাই নববর্ষ-সূচনা লগ্নে পূজারীবৃন্দ গড়িয়া দেবতার পূজা আরাধনাকে কেন্দ্র করে নৃত্য-গীত মুখরিত আনন্দময় জগৎ সংসারের ঠিকানা খুঁজে পায়।

গড়িয়া দেবতাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিবঠাকুর অথবা গণেশ ঠাকুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে তোলা থাক। তর্কের কিনারায় না গিয়ে শুধু এটুকু বলব যে ত্রিপুরী সমাজে পূজিত গড়িয়া দেবতা শিব বা গণেশ ঠাকুরের প্রতিরূপ বলে কল্পনা করার কোন হেতু অছে বলে আমরা মনে করছিনে। কেননা সকল সমাজের মধ্যে নিজস্ব দেব-দেবীর কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-ভাবনা ও বিশ্বাস স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে।

'চৈত্র সংক্রান্তিকে' ত্রিপুরী ভাষায় 'বিষু' এবং আগের দিনটিকে 'হারিবিষু' বলা হয়। 'বিষু' উৎসব ত্রিপুরী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্বণ। এই দিনে সামাজিক মেলামেশার একটি মাহেন্দ্রক্ষণ। বিষুর দিনে ত্রিপুরী সমাজের অনেকেই পানাহারা উৎসব অনুষ্ঠান ও হৃদয়ের আদান প্রদান করে। 'হারিবিষুর' দিনে খুব ভোরে স্নান সেরে নতুন কাপড় পরিধান করে রকমারি বনজ ফুল সংগ্রহ করে। সে ফুল দিয়ে মালা তৈরি করে। এই মালা গরু মহিষের গলায় পরিয়ে দেওয়া

হয়। গরু মহিষের পায়ের কাছে ধূপধুনা দেওয়া হয়। 'হারিবিষু' উপলক্ষ্যে হালচাষ এবং অন্যান্য কাজকর্ম বন্ধ থাকে। এই দিনে পুরুষরা বন থেকে নানা জাতের গাছের শিকড় ; লতা-পাতা ও ফল সংগ্রহ করে — অপরদিকে স্ত্রীলোকেরা রকমারি শাক সবজি সংগ্রহ করে রান্না করে।

গড়িয়া পূজার সূচনা

হারিবিষুর দিনেই গড়িয়া পূজার ঘট বসান হয়। জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজার প্রস্তুতি আরও আগে শুরু হয়। পূজার দিন গৃহস্বামী প্রভাতী লগ্নে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে বন থেকে গোটা বাঁশ কেটে এনে আচাই-এর নির্দেশ মতে উঠোনের পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে পুঁতে দেয়। বাঁশটি কচি হতে হবে। মনে রাখতে হবে গড়িয়া দেবতার প্রতীকী হিসাবে সাধারণত মূলি বাঁশকে নির্বাচিত করা হয়। গড়িয়া দেবের প্রতীকি বাঁশের দৈর্ঘ চার থেকে পাঁচ হাতের বেশি হয়না। প্রতীকী বাঁশকে বেজোড় গাঁট সমেত ফুল দিয়ে সাজানো হয়। প্রতীক বাঁশের নিচের দিকটার পাঁচ কি সাত গাঁটের পাতা ছেঁটে ফেলা হয়। উপরের অংশের পাতা রেখে অচাই বাঁশটিকে 'রিকনা' করেন। অর্থাৎ প্রতীক বাঁশের গায়ে দা দিয়ে সমান্তরাল রেখা এঁকে দেন। এবং বাঁশের সবুজ রং দা দিয়ে সর্পিল রেখাকারে উঠিয়ে নেয়া হয়। যে অংশে পাতা রাখা হয় সে অংশ বাদে নিচের অংশে আনকোরা সুতোয় ফুল ও তুলো গেঁথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। নতুন পবিত্র রিসা প্রতীকে জড়িয়ে দেওয়া হয়। মালায় গাঁথা ফুল ও তুলোর সংখ্যাও বেজোড় হতে হবে। যেমন ৫টি ফুল, ৫টি তুলো অথবা ৭টি ফুল এবং ৭টি তুলো।

সুতো, রিসা, চাল, মদ ইত্যদি পুজোর সামগ্রী অনূঢ়া মেয়েদের হাতে তৈরি না হলে পুজোয় লাগেনা। গড়িয়া প্রতীক উঠোনের নিভৃত কোণে বসাতে হয়। কেননা প্রতীকের ছায়া মাড়ানো নিষিদ্ধ। প্রতীক বাঁশের গোড়ায় কয়েকটি বাঁশের কঞ্চিও পুঁতে রাখার বিধি আছে। পুজোর বেদিতে কলাপাতায় রকমারি ফুল ছড়ানো হয়। বিন্নিধানের খৈ ভেজে পাতার উপর রাখা হয়। ধূপধুনা সহকারে মোরগ ও ডিম গড়িয়া দেবের নামে উৎসর্গ করা হয়।

অচাই এবং সহকারী

পূজার কাজ সম্পাদন করার জন্য অচাই তাঁর সহকারীকে কাছে রাখেন। খুব শুদ্ধাচারে অচাই ও সহকারীকে পূজার কাজ সমাধা করতে হয়। নিরামিষ

ভোজন ও কঠোর ইন্দ্রিয় সংযম পালন না করে পূজা করলে গড়িয়ার পূজা সার্থক হতে পারে না বলে ত্রিপুরীদের বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে।

অচাই ও বারুয়াকে আহবান

প্রথানুসারে পূজার আগেরদিন থেকেই গৃহস্বামীর পক্ষ থেকে অচাই ও বারুয়াকে আহ্বান করতে হয়। এই রীতিকে ত্রিপুরী ভাষায় 'অচাই বাতিমানি' অর্থাৎ পূজার জন্য পুরোহিত আহ্বান নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণত গৃহস্বামীকে রাত্রের খাবারের আগে অচাই, বারুয়া এবং জগাল্যাকে (উলুধ্বনিকারী) বলে আসতে হয়। আহ্বান করার আগে গৃহস্বামী অচাই-এর জন্য এক বোতল মদ, বারুয়ার জন্য আধ বোতল মদ এবং জগাল্যার জন্য পান সুপারি নিয়ে যাবার রীতি আছে। এই আহ্বান গানের মাধ্যমে করতে হয়।

গড়িয়া পূজা ও ফলাফল

আগেই বলা হয়েছে পূজার কাজে আগাগোড়া সাহায্য করেন বারুয়া। তাই পূজার দিন উভয়কেই স্নান সেরে শুচি ও শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে পূজায় বসতে হয়। গড়িয়া পূজার প্রাক্‌কালে 'রন্ধক' ও 'নকছুমতাই' — এই দুই গৃহ দেবতার পূজা সেরে নিতে হয়। খুব ভোরে 'রন্ধক' পূজা করতে হয় — রন্ধক পূজার পরেই নকছুমতাই পূজা করা হয়। সকাল ছ-টার আগেই এই দ্বিবিধ পূজার কাজ সেরে ফেলতে হয়। কেননা সকাল ছ-টা নাগাদ গড়িয়া দেবতার পূজা শুরু করতে হয়। পূজা শুরু হওয়ার আগে অচাই একবার তদারকি করে যান নৈবেদ্য এবং অন্যান্য পূজার আনুষঙ্গিক সামগ্রী যথাযথভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কিনা। এ ব্যাপারে বারুয়াই সব দায়িত্ব পালন করেন। পুজোর আয়োজন সম্পূর্ণ হলে অচাই 'পাতকারনা' করেন। এবং পূজা শুরু করেন। 'পাতকারনা' সম্পন্ন হলে অচাই অনেকক্ষণ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক গড়িয়া দেবের প্রতীক বাঁশে দেবত্ব দান করেন। দেবত্বদানের পর আবার 'পাতকারনা' করেন। ফলাফল ভাল হলে মন্ত্রোচ্চারণ করে গড়িয়া দেবের বেদিতে মোরগ উৎসর্গ করা হয়। মোরগ উৎসর্গ করার সময় জগাল্যা উলুধ্বনি রব তোলে এবং গৃহস্বামী ও পরিবারের লোকজন সকলে এসে গড়িয়া দেবের উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করে।

বলি প্রদানের পর কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত, মাথা ও গলার সামান্য মাংস কেটে প্রতীকের পাদমূলে দিতে হয়। তাছাড়া অচাই নিজের হাতে মোরগের মলদ্বার কেটে খুব সন্তর্পণে অস্ত্র বের করে পরীক্ষা করে দেখেন। অস্ত্র অক্ষত থাকলে

পূজার ফল ভাল হয় এমন ধারণা থাকলেই পোষণ করে থাকে। পূজা শেষ হয়ে গেলে গৃহস্বামী (নক্‌ফাং) উৎসর্গীকৃত মদ ও মাংসের গুণাগুণ সহকারে পূজার ফলাফল অচাই-এর কাছ থেকে জেনে নেয়। এধরনের পূজার ফলাফল জিজ্ঞাসাবাদকে ত্রিপুরী ভাষায় ছেমাছুংগ বলা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের আগে এক বোতল মদ ও একটি লাঙ্গি অচাইকে উপহার দিয়ে পূজার শুভাশুভ জেনে নিতে হয়। এই মদ অচাই নিজে পান না করে উপস্থিত সবাইকে বিতরণ করে দেন। তবে অচাইকে পরিপূর্ণ পাত্রে সবার আগে পান করতে হয়। মদ্য পান করতে করতে অচাই পূজার শুভাশুভ বলতে থাকেন। পূজার ফলাফল ভাল না হলে প্রতিকার স্বরূপ গৃহস্বামীকে উপায় বাতলে দেন।

পূজার পাট চুকে গেলে গড়িয়া দেবের প্রতীক বাঁশের ছায়া যেন কেউ না মাড়ায় সেদিকে নজর রাখতে হয়। ছায়া মাড়ালে অমঙ্গল হবার আশঙ্কা আছে।

গড়িয়া দেবের পদস্নান ও নৃত্য

বিকেল প্রায় তিনটে থেকেই গড়িয়া দেবের পাদমূলে মুরগির ছানা ও ডিম রেখে গড়িয়া দেবের পা ধুইয়ে দিতে হয়। ত্রিপুরী ভাষায় 'য়্যাকুং ছুরুঅ' বলে। এই সময় গৃহস্বামীর কল্যাণ কামনা করা হয়। পা ধোয়ানোর পর ভক্তপ্রাণ আবালবৃদ্ধ যুবকরা প্রতীক বাঁশে জড়ানো রিসা (বক্ষ আবরণী) খুলে নিয়ে তাতে জুমের তুলো, ধান, চাল ও ফুল একত্র করে পুঁটলি করে বেঁধে বর্শার মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর এই বর্শা কাঁধে নিয়ে যুবকেরা মাদলের তালে নানা মুদ্রা বা ভঙ্গিমায় নাচতে শুরু করে। গড়িয়া দেবতার প্রতীককে পূজা স্থলে পুঁতে রেখে তার চারদিকে নাচিয়েরা ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। গড়িয়ার নৃত্যের দল যার বাড়িতে উপস্থিত হয় গৃহস্বামী তার উঠোন জল দিয়ে ধুইয়ে পবিত্রভাবে গড়িয়া দেবতাকে আসন করে দেয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে গড়িয়া দেবতাকে ঘুরানোর সময় গড়িয়া দেবের প্রতীক বাঁশ কাঁধে নিয়ে ঘোরা হয় না। এটাকে পূজাস্থলে গেড়ে রাখা হয়। বাদ্যবাদকরা 'খাম' কাঁধে ঝুলিয়ে নাচের ভঙ্গিমায় নাচিয়েদের সঙ্গে যায় আর খামে বিভিন্ন রকমের তাল ফুটে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা করা — নাচিয়েরা শুধু নিজেদের পাড়াতেই ঘুরে ঘুরে নাচে এবং প্রত্যেক পরিবারের উঠোনে দশ থেকে পনেরো মিনিট ধরে নাচে। খামের তাল বা বোলের মধ্যে যেমন —

১। লাস—

গান্ কি ঘাঘান ঘিচন্ গান
চন্ গান্ গান্ ঘিচন ঘিচন্
ঘিচন চুগান ঘিচন গান্
চন্ গান্ গান্ ঘিচন্ ঘিচন্

২। তক্‌মা মুই ক্রাকমানি — (মুরগির খাবার ভঙ্গি)

গানি গানি ঘান্ চন্ চন্
চুগান্ গাগান্ চন্ চন্

৩। তক্‌মা খিতুং জাংরিমানি — (মুরগির পুচ্ছ নাড়ার ভঙ্গি)

গানি গানি গান্ গানি চন্ চন্
গিগির ঘিচন্ ঘিচন্ চন্
(ঘাবান্ চুগান্ চুগান্ ঘান্)

৪। হারুংমাই কিছিলমানি — (সমতল ভূমির ধান গাছ ভাঙার ভঙ্গি)

গিগির গির গিগির গির
গিগির ঘিচন্ ঘিচন্ চন্
গাগানে ঘান্ গাগানে ঘান্
গাগানে ঘিচন্ চন্
(চুগা গানে গান্ গানি গানি
গান ঃ গান্ কি ঘিচন্ চন্)

৫। তক্‌মা ইয়াচিং মাল্‌মানি — (মুরগির পদসঞ্চালন ভঙ্গি)

চন্‌কে ঘাঘান্ ঘাঘান্ ঘায়ান্ চন্ চন্
গানি চন্ চন্ চন্ কি চুগান
চনি গানি গান চুগান্ ঘান্

৬। মায়ুংছুন্টা চানাইমানি — হাতি কিভাবে খাবার খায় তার ভঙ্গি

গানি চনে গান ঘিচন্ ঘিচন্ ঘিচন্
গাগান্ ঘান্ গানি চন্ চন্
চুগান্ ঘিচন গাগানে গান
গানি চনি গান ঘিচন্।

কোনো ঘরে বা বাড়িতে পৌছার আগে নাচিয়েরা চিৎকার করে গৃহস্থকে জানিয়ে দেয় এই বলে —

'আইলামরে
গাড়িয়া রাজা দেশ বেড়ায়
ঘর গৃহস্থী হজা গো
গড়িয়া রাজা আইসে গো
গড়িয়া রাজা বেড়াতে চায়
দেশ দেশ বেড়াতে চায়
দেশ দেশ নাচতে চায়
চৈত পরব শুনিয়া
বাড়ি বাড়ি বেড়াতে চায়
ঢিলা টংকর ভাঙ্গিয়া
ছাপ ছড়া শুকাইয়া
ঢোলে বাজাইল উজির নাম
খরগ হৈছে বানাইয়া
গড়িয়া আইছে বানাইয়া
গড়িয়া রাজা চিন্তা নাই।'

অর্থাৎ আমরা আসলাম, গড়িয়া রাজা দেশ বেড়াতে চায়। ঘরের মালিক তুমি সজাগ থাক। তোমাকে দেখার জন্য গড়িয়া রাজা এসেছে ইত্যাদি।

আশীর্বাদ দান বা বর রিমানি

নাচের পালা শেষ হয়ে গেলে গৃহস্বামী তাঁদের কাছ থেকে বর বা আশীর্বাদ চেয়ে নেন। গড়িয়া নৃত্যের দল তখন গৃহস্বামীকে বর প্রদান করেন। ত্রিপুরী ভাষায় এটাকে 'বর রিমানি' বলে। আশীর্বাদ গ্রহণ করবার সময় গৃহস্বামী একটি থালায় আনকোরা শ্বেতবস্ত্র বিছিয়ে তার উপর দু-একটি রুপোর টাকা ফুল ও তুলো রেখে থালা হাতে করে হাঁটু গেঁড়ে বসেন এবং গড়িয়া দেবতার কাছে বর প্রার্থনা করেন। তাঁর একান্ত প্রার্থনা হল যেন আগামী বছরেও এইভাবে পুজো করে আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন। নৃত্যের দল তখন রিয়ায় বা রিসায় জড়ানো তুলো, চাল ও ফুল ইত্যাদি পুজোর অর্ঘ্য বর স্বরূপ গৃহস্বামীকে অর্পণ করেন। গৃহস্বামী এইগুলোকে সিন্দুকে রেখে দেন। নাচিয়েরা যাবার সময় গৃহস্বামীর সুখ

সমৃদ্ধির কামনা করে চলে যান।

যাবার আগে 'মদ' ও 'বুতুক' খেতে দেওয়া হয়। তা ছাড়া ডিম, শুকনো মাছ ও মাংস তাদের দেওয়া হয়।

বিসর্জন

পাড়া পরিক্রম হয়ে গেলে বিসর্জনের পালা আসে। বিসর্জন দেওয়ার আগে গড়িয়া দেবের প্রতীক এক জায়গায় জড়ো করা হয়। প্রণাম করে প্রতীক বাঁশকে তুলে নিয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়। গভীর রাত্রে কাছাকাছি ছড়া বা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। কল বা বর্শাকে বিসর্জন দেওয়া হয় না।

গড়িয়া দেবতা ঃ ধর্ম-সংস্কৃতি ও কৃষির দেবতা

দশরথ দেব

স্মরণাতীত কাল থেকে ত্রিপুরী সমাজে গড়িয়া দেবতা সম্পদ ও সমৃদ্ধির দেবতারূপে (God of wealth and prosperity) পূজিত হয়ে আসছেন। সুতরাং ধন ও সমৃদ্ধির কামনা বাসনাকে চরিতার্থ করার মানসেই পূজারীবৃন্দ কায়মনোবাক্যে গড়িয়া দেবতার কাছে ভক্তিনম্র চিত্তে প্রার্থনা জানায়। ত্রিপুরী সমাজের উপাস্য গড়িয়া দেবতাকে বাঙালি হিন্দু সমাজে সর্বজন পূজিত সিদ্ধিদাতা গণেশ বা গণপতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই তুলনামূলক বিচারে দ্বিবিধ যুক্তির অবতারণা করা যায়। প্রথমত গণপতি বা গণেশ হচ্ছেন ধন বা ঐশ্বর্যের দেবতা। তাঁকে উপাসনা করলে বিত্তবান হওয়া যায়। এই সরল বিশ্বাসে বশবর্তী হয়ে পূজারীবৃন্দ গণেশ পূজা করে থাকে। দ্বিতীয়ত ত্রিপুরীদের গড়িয়াদেবতার মূর্তির পরিকল্পনায় গণপতির শুঁড়ের প্রতিফলন অনুমিত হয়। গড়িয়াদেবতার মূর্তির প্রতীক বাঁকানো বাঁশে ফুটে উঠেছে গণপতির মুণ্ডমূর্তির পরিকল্পনার ইঙ্গিত। এই শুঁড়াকৃতি বাঁকানো বাঁশের অগ্রভাগকে পবিত্র রিসা (ত্রিপুরী রমণীদের বক্ষ আবরণী বস্ত্র) দিয়ে জড়িয়ে রাখা হয়। এই ধরনের প্রতীকী মূর্তি পরিকল্পনায় ত্রিপুরীদের অনুন্নত স্থাপত্য শিল্পচেতনার পরিচয় বহন করে — এমন অনুমান করা অমূলক নয়। পক্ষান্তরে এমন যুক্তিও দাঁড় করানো যায় যে, ত্রিপুরী সমাজে গড়িয়া দেবতা পূজা প্রচলনের আদিলগ্নে শুধু ত্রিপুরী কেন কোন সমাজেই হয়তো স্থাপত্য শিল্প বিকাশ লাভ করেনি, তাই ধাতু নির্মিত মূর্তির পরিবর্তে শুধুমাত্র প্রতীক মূর্তির পূজা প্রচলিত হয়ে এসেছে। পরবর্তীকালে প্রতিবেশীসমাজে মূর্তিশিল্প গড়ার অগ্রগতি সত্ত্বেও ঐতিহ্যবাহী প্রতীক পূজার পরিবর্তন ঘটেনি, এমনও হতে পারে চিরাচরিত প্রতীক পূজার ধারাভঙ্গ করতে সংস্কারবদ্ধ ত্রিপুরী সমাজ এগিয়ে আসেনি। তাই সেই একই tradition টিকে রয়েছে। পুরোনো প্রথাকে অপরিবর্তিত রাখার মনের সংস্কার মানব সমাজের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

অপরদিকে জমাতিয়া সমাজে পূজিত গড়িয়া দেবতার মূর্তিকল্পনা সম্পূর্ণ

আলাদা, ত্রিপুরীদের মতো জমাতিয়ারা বাঁশের প্রতীক পূজা করে না। জমাতিয়াদের গড়িয়াদেবতার মূর্তি সোনার তৈরি এবং সে সম্পূর্ণ এবং আবক্ষও নয় — শুধু মহাদেবের মাথা ও মুখের আদলে ছোট্ট একটি মুণ্ডমূর্তিকে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে অনেকটা দরবেশের ঢিলেঢালা লম্বা হাতলের পোশাকের মত করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। পূজাপদ্ধতিতেও ত্রিপুরীদের সঙ্গে অনেকটা অমিল দেখা যায়। জমাতিয়া সমাজে পূজিত সোনার তৈরি মুণ্ডমূর্তির ব্যবহার থেকে অনুমান করা যায় যে জমাতিয়াদের গড়িয়াদেবতার পূজার প্রচলন ত্রিপুরীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন। সম্ভবত ভিন্ন সমাজে সোনার ব্যবহার প্রচলনের আদিপর্বে অথবা আরো পরবর্তী যুগে জমাতিয়া সমাজে গড়িয়াপূজার প্রচলন হয়ে থাকতে পারে। বাঙালি হিন্দুদের পূজাপদ্ধতির সঙ্গে ত্রিপুরীদের গড়িয়াদেরতার পূজার উপকরণাদিরও অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ধান-দূর্বা-পবিত্র বস্ত্র বাঙালির যে কোন উপাস্য দেবতার পূজার অপরিহার্য উপকরণ। ত্রিপুরীদের গড়িয়া দেবতার পূজার উপকরণাদিও অনেকটা ঐ রকম।

সকল সম্প্রদায়ের মানুষের দেবদেবীর অস্তিত্বমাত্রই কিংবদন্তী প্রবাদ রঞ্জিত। ত্রিপুরী সমাজে পূজিত গড়িয়া দেবতার উদ্ভবের নেপথ্যালোকে যে কিংবদন্তী বা জনশ্রুতি আছে তাতে বলা হয়েছে গড়িয়া দেবতা মূলত যুদ্ধের দেবতা। তাই গড়িয়া নৃত্যের মধ্যে যুদ্ধনৃত্যের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

গড়িয়া পূজার শুরু থেকে বিসর্জন পর্যন্ত (১লা বৈশাখ থেকে ৭ই বৈশাখ) প্রতিটি পর্যায়ে নৃত্য-গীত পরিবেশিত হয়। গড়িয়া দেবতার উদ্দেশ্যে ভক্তিশ্রদ্ধা উৎসর্গ করার জন্যই নৃত্য-গীতের প্রচলন হয়েছে। পূজারীদের সরল বিশ্বাস ধনের দেবতা গড়িয়া ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করলে গড়িয়া দেবতা সুখ ও সমৃদ্ধি দান করবেন। মঙ্গলময় গড়িয়া দেবতার কাছে একান্ত প্রার্থনা নিবেদন করলে নিষ্ফল হবার নয়। সুতরাং যে দেবতার প্রতি শুধু সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য আত্মনিবেদনের সুরই প্রাধান্য লাভ করেছে যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়ের বাসনার সুর সেখানে একান্ত গৌণ। তাই গড়িয়া দেবতার পূজার মধ্যে যে নৃত্যগীতের সুর ও তাল সংযোজিত হয়েছে সেখানে বীররসের পরিবর্তে ভক্তিরসের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয। নৃত্যগীতের মধ্যে যে যুদ্ধের প্রসঙ্গ অন্তর্নিবিষ্ট করা হয়েছে তা বোধহয় জীবন ও জীবিকার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যে সংগ্রাম করতে হয় তারই প্রতিফলন। গড়িয়া নৃত্যের প্রাচীন রীতি (form) আজকাল পুরোপরি অনুসৃত হয় না। অর্থাৎ নাচের যে বিস্তৃতি (elaborate) ছিল তা আজকাল সংক্ষিপ্ত আকার

নিয়েছে। বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। তাই ফসলবৃদ্ধির উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই পূজা ব্রত পার্বণের উদ্ভব হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরী জুমিয়া সমাজেও জুম চাষকে কেন্দ্র করে নানা ব্রত পার্বণের উদ্ভব। গড়িয়া দেবতা ধনের দেবতা হিসাবে পূজিত হয় বলেই জুমচাষের প্রতিটি স্তরে (Phase) গড়িয়া দেবতাকে আরাধনা করা হয়। জুম কাটার সময় নানা বিপদের আশঙ্কা করে বিপদনাশিনী বনদেবীর পূজা করার রেওয়াজ আছে। ত্রিপুরী ভাষায় তাকে বলা হয় 'ওয়ালৌং কাটে অ'। ভাষান্তরে যাকে বিপদভঞ্জনও বলা যেতে পারে। কাটা বন সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে গেলে চৈত্র মাসে জুম পোড়া হয়। অতঃপর বৈশাখ মাসে বীজ বপনের পালা। বীজ বপনের আগে সদ্য পোড়া জুমক্ষেত্রটিকে মসৃণ করে নিতে হয়। বীজবপনের পর ধানগাছ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আগাছা, লতাপাতাও সমানতালে বাড়তে থাকে ; তখন জুম সাফাই কাজ (Weeding) শুরু হয়। এই জুম সাফাই তিনবার পর্যন্ত করার প্রয়োজন পড়ে। তবে ভালভাবে পোড়া জুম দুবারের বেশি সাফাই করতে হয় না। কেননা উত্তমরূপে পোড়া জুমক্ষেত্রে আগাছা কম জন্মে।

জুমচাষের শেষ পর্ব হল ধানকাটা বা ফসল তোলা। ফসল তোলার উপলক্ষে গান ও নাচ পরিবেশনের রীতি প্রচলিত আছে। ঐসবের পেছনে একই উদ্দেশ্য — সুখ ও সমৃদ্ধির কামনা করা।

ত্রিপুরী সমাজে পূজিত গড়িয়া দেবতার পরিবারগত বা ঘরোয়া পূজার গণ্ডি পেরিয়ে বারোয়ারি বা সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করেনি। ত্রিপুরী সমাজে প্রতিটি পরিবারের লোকের মঙ্গলের জন্য গড়িয়া পূজা করা হয়। বাঙালি হিন্দুসমাজে পূজিত চড়কপূজা. দুর্গাপূজা এবং কালীপূজা একসময় পরিবারগত বা ঘরোয়া পূজা ছিল।

কালক্রমে ঘরোয়া থেকে বারোয়ারি বা সার্বজনীন রূপ নেয়। যে সমাজে devotion বা ভক্তি অথবা দৈবশক্তির প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা বর্তমান সে সমাজের লোকেরা তাদের পূজিত দেবদেবীকে ঘরোয়াভাবে পূজা করেন। কিন্তু পূজা উৎসব যখন শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ না থেকে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিভূ হয়ে দাঁড়ায় তখন সে পূজা সার্বজনীন রূপে নেয়। কালীপূজা, দুর্গাপূজা এখন বাঙালি হিন্দু সমাজে সংস্কৃতির উৎসব হিসাবে সার্বজনীনরূপে পূজিত হচ্ছে।

মানুষের মনে গভীর ভক্তি ভাব বা devotion জাগ্রত না হলে সত্যিকারের

পূজা হয় না। তা ভগবানের প্রতিই হোক বা মানুষের প্রতিই হোক। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করতে না পারলে devotion বা ভক্তি আসে না। এই ভক্তিভাব পূজাপার্বণকে কেন্দ্র করেই উৎপত্তি হয়েছে। সব সমাজেই এই ভক্তিরসাশ্রিত পূজা প্রচলিত আছে। ভারতীয় সংস্কৃতি নাচ, গান ও ভক্তির আশ্রিত পূজাপার্বণকে কেন্দ্র করেই উৎপত্তি হয়েছে। ত্রিপুরীসমাজের কৃষিভিত্তিক গড়িয়া সংস্কৃতি ভারত তথা জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জুমচাষের উৎপাদনের যে আনন্দ, নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাকে ত্রিপুরী সমাজের কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়। এই ত্রিপুরীসংস্কৃতিকে অনেকেই উপজাতীয় সংস্কৃতি বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা শব্দ প্রয়োগে ভুল করেন। উপজাতীয় বা tribal culture বললে বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে বোঝায়। সুতরাং গড়িয়া সংস্কৃতিকে যদি কেউ উপজাতীয় সংস্কৃতি বলে অভিহিত করে থাকেন — তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন এসে দাঁড়াবে কোন্ উপজাতির সংস্কৃতি! তাই ককবরকভাষীদের মধ্যে পূজিত গড়িয়াদেবতাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি কম বেশি বিকশিত হয়ে উঠেছে তাকে ত্রিপুরী সংস্কৃতি বলাই সঙ্গত। গড়িয়া সংস্কৃতিকে উপজাতীয় সংস্কৃতি বা tribal culture বললে ত্রিপুরার বসবাসকারী যে কোন উপজাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে বোঝায়। সুতরাং গড়িয়া সংস্কৃতিকে ত্রিপুরী সংস্কৃতি বললে শব্দপ্রয়োগে বিভ্রান্তি দেখা দেবে না। আজকাল tribal বা উপজাতি শব্দ ব্যবহারে অনেকেই আপত্তি করেন, কেন না উপজাতি শব্দের অর্থের হীনভাব (derogatory) বোঝায়। তাই tribal কথাটিকে বাদ দিয়ে nation in the making কথাটি ব্যবহার করে থাকেন। যেমন ভারতবর্ষকে অনগ্রসর (under developed) দেশ না বলে বিকাশশীল দেশ (developing Country) বললে নিজের দেশকে খাটো করা হয় না অনেকটা ঐ রকম। সমাজের অগ্রগতি যেমন থেমে থাকে না তেমনি তার সংস্কৃতিও স্থাণু হয়ে থাকে না। কালক্রমে তার প্রসার ঘটবেই। কিন্তু চর্চা বা প্রচার ব্যতিরেকে কোন সংস্কৃতিই বিকাশলাভ করে না। সফল শ্রেণীর মানব গোষ্ঠীর সংস্কৃতির রূপ এক না হলেও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে জাতীয় সংস্কৃতির রূপ নেয়। তাই সংস্কৃতিকে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা যেতে পারে। গড়িয়া দেবতা শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় ত্রিপুরী বা ককবরকভাষীদের পূজিত বলে এই পূজাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সে সংস্কৃতি শুধু ত্রিপুরী সমাজের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না — গড়িয়া সংস্কৃতিকে সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর আচরিত সংস্কৃতি বলে মনে করা যায়।

পূজাপার্বণ আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমাজ দেহে ঐতিহ্যের ধারায় অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু সংস্কৃতি এক জায়গায় থেমে থাকে না — সংস্কৃতির অগ্রগতির সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। গড়িয়া সংস্কৃতির রূপরেখাকে প্রগতির পথে যারা নিয়ে যেতে চায় এমন প্রগতিবাদীরা গড়িয়া পূজায় অচাই সমাজের সংকীর্ণতর দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সোচ্চার। কেন না অচাই (পূজারি) সমাজ ত্রিপুরী সমাজকে প্রগতির নিশানা দেখতে পারবে না। সে মানসিকতা তাদের নেই। যারা সংকীর্ণতার চৌকাঠ থেকে এক-পা বাড়াবার মানসিকতার অধিকারী নয়, তারা শুধু নিজেদের tribal বলে ঘোষণা করে নিজেদেরই কোণঠাসা করে রাখছে। কিন্তু সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধনের কথা তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় না। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে fascisam-এর বীজ সুপ্ত রয়েছে। যারা শুধু নিজেদের সমাজের মানুষকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে অন্যদের কথা ভাবে না, ভাবতে শেখে না তাদের fascist বা উগ্রবাদী ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ঐ হিটলারি মনোভাব আজকাল প্রগতিশীল জগতে অচল। তাই গড়িয়া সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ঐ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক চেতনাকেই চাঙ্গা করে দিতে হবে। শুধু গড়িয়াপূজা পার্বণ উৎসবকে আঁকড়ে থাকলে চলবে না। গড়িয়া সংস্কৃতির চর্চা প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জাতীয় সংহতির ভাবকে সমৃদ্ধ করে বিচ্ছিন্নতাবোধকে বিসর্জন দিতে হবে। গড়িয়া সাংস্কৃতিক উৎসবকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্রানুষ্ঠান উদ্‌যাপন করি তার লক্ষ্য হচ্ছে সার্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসব গড়ে তোলা। গড়িয়া সাংস্কৃতিক উৎসবে আমরা মেতে উঠেছি নতুন ও সুন্দর পৃথিবীর জন্ম দিতে। যে পৃথিবীতে কোন বিচ্ছিন্নতাবাদ বা সংকীর্ণতাবোধ থাকবে না। পরিশেষে বলছি, গড়িয়া সংস্কৃতি সংকীর্ণতার সংস্কৃতি নয় — তাই গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি জন্ম নিয়েছে তা প্রগতির পথ দেখাবে। এ সংস্কৃতিকে উত্তরোত্তর প্রসারিত করাই আমাদের লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে পুরাতনকে বিসর্জন দিয়ে নতুনের আবাহন নয়। গড়িয়াপূজা আমাদের সমাজে যেমনটি ছিল তা চিরদিন থাকবেও। কিন্তু এর সংস্কৃতিকে চর্চার মাধ্যমে সার্বজনীন করে তুলব। অতীতকে সামনে রেখে ভবিষ্যৎকে সুন্দর এবং সমৃদ্ধ করে তুলব — তা হলে উৎপাদনের মাধ্যম হিসাবে গড়িয়া সংস্কৃতির চর্চা ফলপ্রসূ হবে।

কৃষিকেন্দ্রিক মানব-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

সুরেন দেববর্মন

মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার উষালগ্ন থেকেই বাঁচার তাগিদে মানুষ জীবিকার উপায় উদ্ভাবনের পথে নেমে পড়েছিল। এমনি করে সে আবিষ্কার করল উৎপাদনের কৌশল। এই উৎপাদনের কৌশলই কৃষিকাজ। তখনও রামপ্রসাদের "মানব জমিন" আবাদ করে জ্ঞানরূপ সোনার ফসল ফলাবার দিন আসেনি। শুধু মাটির জমিন আবাদ করেই শস্যাদি ফলিয়ে উদরপূর্তির উপায়টুকু মানুষ অর্জন করতে পেরেছিল। জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষিকর্মকে কেন্দ্র করে মানবসমাজ মানসে জন্ম নিল নানা সংস্কার ও বিশ্বাস। এই সংস্কার ও বিশ্বাসের ভূমিতে জন্ম নিল মানুষের ধর্মীয় ভাবনা, নানা আচার অনুষ্ঠান পূজা পার্বণ ও নানা দেবতা ও অপদেবতার প্রতি আস্থা। এটা চলে আসছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। এ যুগের জীবিকার বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি তখনও মানুষের চিন্তার বাইরে ছিল। একমাত্র কৃষিকর্মই তখন জীবিকার প্রধান তাগিদ। তাই আজকের মানব সমাজে উদ্‌যাপিত নানা দেব দেবীর পূজানুষ্ঠান আচার ব্রত, প্রথাগত নিয়ম কানুন সবই আদিম যুগের কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। বেশির ভাগ পার্বণের উৎসই হল কৃষি।

শস্যের দেবতার কল্পনা এবং আরাধনা শুধু আদিবাসী সমাজেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্বয়ং ভগবতী দেবী দুর্গাকেও শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে পূজা করা হতো। প্রসঙ্গত স্বামী প্রজ্ঞানন্দের মন্তব্য এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "রামায়ণ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্গা শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা হতেন তার উল্লেখ আছে। শাকম্ভরী, দুর্গার অপর এক নাম। পৃথিবীরও নাম শাকম্ভরী। পৃথিবীর আর এক নাম সীতা। পৃথিবীই দেবী দুর্গা, কারণ পৃথিবীর নাম অদিতি যাকে বেদে ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে সূর্য তথা মিত্র দেবতার জননীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। শাকম্ভরীই অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা তথা অন্নদা।"

অনুরূপভাবে বঙ্গদেশীয় হিন্দু সমাজের সর্বজন পূজিতা লক্ষীদেবীও ধর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে অথবা কৃষিদেবীরূপেও কল্পিত হন। এরূপ শস্যদেবীর কল্পনা এবং পূজা অনুষ্ঠান শুধুমাত্র বঙ্গভূমির সমাজেই সীমাবদ্ধ তা মনে করলে ভুল

হবে। পৃথিবীর সব দেশেই আদিম উপজাতি সমাজে শস্যদেবীর পূজার প্রচলন রয়েছে।

ত্রিপুরী সমাজে পূজিতা মাইলুংমা (ধানের দেবী) এবং খুলুংমা (কার্পাস দেবী) শস্যমাতার কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। অনুরূপভাবে শস্যক্ষেত্রে শস্যমাতার অধিষ্ঠান কল্পনা বিরাজ করে জার্মান সমাজে। ফসল পাকার জন্য শস্যমাতার কৃপা ব্যতিরেকে সম্ভব নয় এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে জার্মান কৃষকসমাজ। তাই তারা শস্যের আঁটিকে কাপড় পরিয়ে নারী মূর্তিসদৃশ কল্পনা করে শস্যক্ষেত্রে স্থাপন করে রাখে। মেক্সিকো, ব্রিটেন, স্কটল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সেও শস্যে দিয়ে নারীমূর্তির প্রতীক কল্পনার প্রথা চালু রয়েছে। রাশিয়ার শস্যের শেষ গুচ্ছকে নারীমূর্তি সাজানো হয় এবং নৃত্যগীত সহকারে খামারে এনে স্থাপন করার রীতি প্রচলিত। বুলগেরিয়ায় শস্যের নারী মূর্তিকে শস্যরানি বলে কল্পনা করা হয়। সে দেশে শস্যরানির মূর্তিকে নিয়ে গ্রাম পরিক্রম শেষে জলে বিসর্জন দেওয়ার প্রথা প্রচলিত। কোন কোন সময় মূর্তিটিকে পুড়িয়ে ছাইগুলি শস্যক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়ায় ফসল কাটা শেষ হয়ে গেলে বিপুল সমারোহে শোভাযাত্রায় শস্যরানিকে গাড়িতে বসিয়ে বের করা হয়। অনুরূপ প্রথা প্রচলিত আছে আমেরিকাতেও অতি প্রাচীনকাল থেকে। সুমাত্রাদ্বীপে ফসল লাগানো এবং ফসল তোলার সময় নানা আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। শস্যের শেষগুচ্ছ বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ছাতার নীচে বয়ে আনা হয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে বাংলার বধূকুল আচরিত লক্ষ্মী পূর্ণিমা তিথিতে কোজাগরি লক্ষ্মীপূজা সুদূর ভিন্নদেশীয় মেক্সিকোয় অনুরূপ অনুষ্ঠান পালিত হয়। সেদেশে এই তিথিতে মেয়েরা এলোকেশী হয়ে থাকে — তাদের বিশ্বাস এতে শস্যের গুচ্ছ এলোকেশীর মতো লম্বা হয়ে উঠবে। একই প্রথা রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলন আছে। তারা বীজ বোনা এবং ফসল তোলার সময় কঠোর ব্রত পালন করে।

ত্রিপুরী সমাজে যেমন জুম চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে নাচ গানের মহড়া চলে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তেও তার ব্যতিক্রম নেই। বাংলার হিন্দু সমাজে প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী সন্তানসম্ভবাকে সাধ খাওয়ানোর মতই পৃথিবীর আদিবাসী সমাজে শস্যমাতাকে গর্ভবতী কল্পনা করে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানোর বিধি প্রচলিত রয়েছে।

মালয় ও অন্যান্য বহুদেশে প্রচলিত শস্যমাতার পূজার আরও বিচিত্র ধরনের পরিচয় মেলে। ঐ সব দেশে শস্য ক্ষেত্রে থেকে গোটা সাতেক শস্যগুচ্ছ

কেটে এনে তেল মাখিয়ে রঙিন সুতো বেঁধে সাদা কাপড় পরিয়ে ধূপধুনো দিয়ে লম্বা ধরনের একটি ঝুড়িতে বসানো হয়। অপর একজন স্ত্রীলোক সেটিকে নিয়ে কৃষকের বাড়িতে যায়। সূর্য কিরণ যাতে না লাগে তার জন্য মাথায় ওপর ছাতা ধরে রাখতে হয়। সেই ঝুড়ি বাড়িতে পৌঁছাবামাত্র একটি পরিবারের অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা বিপুল সমারোহে অভ্যর্থনা জানায়। অতঃপর দোলনায় বিছানা পেতে শুইয়ে দেওয়া হয়। নবজাত মানব শিশুর জন্য যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পালনীয় কৃষক পত্নীকে সবই মানতে হয়। এই উপলক্ষে কৃষক পত্নী তিনদিন ব্যাপী নিয়ম নিষ্ঠা পালন করে।

বঙ্গদেশ তথা ভারতের বিভিন্ন সমাজে অনুসৃত এবং আচরিত বিবিধ প্রথাও বিশ্বাস তথা বহির্ভারতীয় বিভিন্ন সমাজেও বর্তমান রয়েছে। জাভা, বালি এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশে ফসল কাটার সময় একগুচ্ছ শস্যের শিষ একত্র বেঁধে বিয়ে দেওয়া হয় এবং বরকনের জন্য বাসর রচনা করতে হয়। আমাদের দেশেও নানা জায়গায় অনুরূপ প্রথা প্রচলিত আছে।

এই প্রসঙ্গে 'লোকায়ত দর্শন' গ্রন্থের প্রণেতা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "দক্ষিণ ভারতে নানা উপজাতির মধ্যে দেখা যায়, বিবাহ অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে বরকে মাটি চষবার বা মাটি চষা সংক্রান্ত কোন ক্রিয়ার অনুকরণ করতে হয়"। কৃষিকর্মকে কেন্দ্র করে যে মানব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এবং কৃষি সংস্কৃতি ও মানব সমাজ সংস্কৃতি এদুয়ের মধ্যে যে আদিম যোগসূত্র রয়েছে উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায়।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবী দুর্গা পূজার অষ্টমী তিথিতে অনুষ্ঠিত কুমারী পূজার অনুরূপ ত্রিপুরী সমাজেও শস্যকুমারীর পূজা (মাইলুংমা) প্রচলন রয়েছে। ত্রিপুরী সমাজের মাইলুংমা এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুমারী পূজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় অনূঢ়া মেয়েরা। সুতরাং কৃষিকর্ম নামধেয় আদিমতম জীবিকা নিঃসন্দেহে ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল উৎস।

সমন্বয়ের দেবতা গড়িয়া

মনোরঞ্জন মজুমদার

দেবতায় অরুচি নেই ভারতবাসীর। এটা যে শুধু ভারতের একচেটিয়া গুণ তা বলতে চাইছিনা, হয়ত ভিন্ন দেশের লোকেদের মধ্যেও এমন ভাব থাকতে পারে। তবে ভারতের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। তা হল তার সমন্বয়ী মনোবৃত্তি ; সবকিছুর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সকলের জন্যে মনের দরজা খোলা রাখার, সকলকে নিজের মধ্যে একান্ত করে নেওয়ার এবং নিজেকে সকলের মধ্যে বিস্তৃত করে দেওয়ার সহজাত প্রবৃত্তি।

ইতিহাসের কাল থেকেই গ্রিক, মঙ্গোল, ইরানি, তুরানি প্রভৃতি বহির্ভারতীয় জাতিরা বিজয়ীর বেশে ভারতে প্রবেশ করেছে, আবার তারাই বিজিতের মত ভারতবাসী বনে গেছে। এর প্রধান কারণ হল ভারতের অবস্থান। উত্তরে বিশাল হিমগিরি, পশ্চিমে উগ্র থর-মরু, পূর্ব-দক্ষিণ পশ্চিমে অকুল সাগর-মহাসাগর। প্রকৃতি যেন তার সকল বিশালতা, চরমতা ও প্রচণ্ডতা নিয়ে এখানে আবির্ভূত। এসব চরমতার মুখোমুখি হয়ে আপন তীব্রতা হারিয়ে মিলে ঝুলে একটা সহনশীল, সহানুভূতিপূর্ণ হার্দ্য মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যা মানুষের মন থেকে সকীর্ণতা দূর করে দেয়, দূরকে কাছের করে, পরকে আপন করে দেয়। তাই আমরা যুগে যুগে ভগবানকে এদেশে জন্ম নিতে এবং বিশ্ববাসীকে কৃপা বিতরণ করতে দেখি। ফলে ভারতবাসী একটা মহাসম্পদের অধিকারী হয়েছে সেটি হল তার মন। বহিরঙ্গ ভাবে ভারতবাসী কালে ভাদ্রে পর-করতলগত হলেও তার অন্তস্থ মনটাকে কেউ কোন কালেই কব্জা করতে পারেনি। এটা সর্বকালেই স্বাধীন, উন্মুক্ত ও উদ্দাম রয়েছে। বিশ্বের সকল খণ্ডক্ষুদ্র চিন্তা এখানে এসে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে এক নবরূপে রূপায়িত হয়েছে যেমন করে সকল রং কালো রং-এ আত্মলোপ করে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুবর্গ চারটি স্বতন্ত্র ধারা রূপে বিকশিত হলেও ভারতীয় চিন্তাস্রোতে অবগাহন করে একীভূত হয়ে গেছে মানব-জীবনকে পূর্ণতা দিতে। মানব-জীবন সার্থক হয়ে উঠেছে এই চিন্তা চতুষ্টয়ের মহামিলনে। ভারতীয় ঋষিরা নিষ্কাম ভাবে জীবনে এই চতুর্বগকে অনুশীলন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা পুরাণে, মঙ্গলকাব্যে, মহাকাব্যে তারই প্রতিফলন দেখতে পাই।

ভারতীয় সংস্কৃতি মিশ্র। এতে অনার্য, আর্য, আদিবাসী, আগন্তুক, গিরিজন, হরিজন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেরই অবদান রয়েছে। এই সমন্বয়ে সম্ভব হয়েছিল মুক্ত চিন্তার ফলে। এ সম্পর্কে ডঃ মূয়ারের মন্তব্য প্রতিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের ধ্যান-রাজ্যে চিন্তার স্বাধীনতা ছিল। এর দরুন কোন কিছু কেউ বর্জন না করে তার সহযোগিতা অর্জন করার, তার মধ্যেকার ভালোটাকে গ্রহণ করার প্রবৃত্তি ভারতবাসীর মধ্যে জন্মেছে। মিশ্র সংস্কৃতি সকল দিক দিয়েই সকলের জন্যে মঙ্গলকর হয়ে উঠেছে। এর ফলে লোকায়ত চিন্তা, বৈদিক চিন্তা, বস্তুবাদ, ভাববাদ, নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতির একটা সুষম সংমিশ্রণ ঘটেছে। বৃহত্তম স্রোতে মিলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকর ধারণ করেছে।" এই দৃষ্টিতে ভাবলে আমার ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বজনীন দেবতা গড়িয়ার মধ্যেকার বৃহৎ ভাবটি অনুধাবন করতে সক্ষম হব।"

প্রত্যেক জাতিরই একজন দেবতা আছেন যিনি সেই জাতির শিক্ষা সংস্কৃতি থেকে আরম্ভ করে দৈনন্দিন জীবন যাত্রা পর্যন্ত সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। যেমন, বাঙ্গালীর দুর্গা, অসমীয়ার বিহু, দক্ষিণ ভারতের ওনাম, মধ্য ভারতে গণেশ-চতুর্থী উত্তর ভারতের দশেরা আর ত্রিপুরাবাসীর গড়িয়া। গড়িয়া মুখ্যত আদিবাসীদের দেবতা হলেও ত্রিপুরাবাসী প্রত্যেকের সম্মান শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন।

কে এই গড়িয়া দেবতা? এসম্বন্ধে সূত্রাকারে একটু আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারব তার সর্বভারতীয় চরিত্রটি। গড়িয়া ত্রিপুরার আদিবাসীদের পূজা হলেও ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এঁকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধাভক্তি করে থাকে। এটি জমাতিয়া সম্প্রদারের মধ্যে সার্বজনীন ভাবে এবং ত্রিপুরী, কলই. রিয়াং প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহপূজা হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। এর পীঠস্থান ভোতাবাড়ীতে। গড়িয়ার স্বতন্ত্র কোন মূর্তি নেই। শুধু মস্তকটি খেরফাৎ বা পুরোহিত হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে জমাতিয়া সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণে থাকে। পূজার ৮ দিন তাঁকে অবয়বযুক্ত রাখা হয়। অপরাপর সম্প্রদায়ের লোকেরা অস্থায়ীভাবে মূর্তি গড়ে নেয়। গড়িয়া পূজা চৈত্রসংক্রান্তির দিন থেকে বৈশাখের ৭ম দিন পর্যন্ত চলে। জমাতিয়াদের কাছে গড়িয়া হলেও গৌরহরি বা মহাদেব এবং অপরাপর সম্প্রদায়ের কেউ বলেন শিব এবং কেউ বলেন গণেশ। গড়িয়ার সঙ্গে থাকেন মাইলুংমা-খুলুংমা নামক দেবতা তাঁরা শস্য ও ধনের দিকটা দেখাশুনা করেন। আর এক দম্পতিও থাকেন. তাঁরা হলেন কোনা দেবতা। অনুমান করা হচ্ছে এঁরা নাগ দম্পতি। এঁরা অসুখ অশান্তির দিকটা দেখাশুনা করেন। রীতিনীতির কিছু পার্থক্য থাকলেও গড়িয়ার দেবকল্পনায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই।

ত্রিপুরাবাসীদের শৌর্য-বীর্যের প্রতীক, সার্বজনীন দেবতা এই গড়িয়া দেবতা আসলে কে? তিনি কি আদিবাসীদের একজন স্বতন্ত্র দেবতা না ভারতীয় দেবতাকুলের একজন তা অনুশীলন করে দেখা যেতে পারে।

পবিত্র গড়িয়া দেবের মূর্তি কল্পনা, পূজা পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিকে দ্রব্যাদি লক্ষ করলে গণেশ ও মহাদেবের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। পূজাতে গড়িয়ার যে প্রতীক বাঁশটি রোপণ করা হয় তার অগ্র-ভাগ গণেশের মাথার মত। জুমের পবিত্র তুলোয় কাটা সুতোর বেড়টি ব্রহ্মসূত্রের প্রতীক হতে পারে। ত্রিশুল, গঞ্জিকা মহাদেবের ব্যবহার্য। প্রতীক বাঁশটিতে ঝুলিয়ে রিসা-রূপ বস্ত্রখণ্ড গণেশ বা শিবের গাত্রাবরণ হতে পারে। এই দেবতার কাছে কামনা করা হচ্ছে অন্ন, অর্থ, রোগ মহামারী থেকে মুক্তি, স্বাস্থ্য ও সুখশান্তি। এগুলোর দেবতা শিব ও গণেশ। উপজাতিরাও গড়িয়া বাবাকে গণেশ বা মহাদেব বলে অর্চনা করেন। এসব থেকে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে গড়িয়া গণেশ বা মহাদেব ছাড়া কেউ নন।

বিভিন্ন পুরাণে, ধর্মশাস্ত্রে, মহাকাব্যে গণেশকে ভিন্ন ভিন্ন নামে, নানা ভাবে দেখানো হয়েছে। লোকায়ততে গণেশকে গণ অর্থাৎ জাতি বা দলের অধিপতি হিসাবে দেখানো হয়েছে। লোকায়তের আদিগুরু বৃহস্পতি ঋগ্বেদের মন্ত্র অনুসারে বৃহস্পতি আর গণপতিতে তফাৎ নেই। বামাচার বা তন্ত্রের সাথেও ওই গণেশ জড়িত। বামাচার বা তন্ত্র থেকেই শৈব, শক্তি প্রভৃতি মতের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন প্রাচীন মন্দির গাত্রে মৈথুনরত গণেশকে দেখা যায়। বৈষ্ণব ও সহজিয়াদের দেব ভাবনায় গণেশ বর্তমান। বুদ্ধদেব আর গণেশও এক। মুনিয়ার সাহেব বলেছেন, গণেশের একটি নাম হল বিনায়ক এবং বিনায়ক বলতে বুদ্ধকেও বোঝায়।' আর্যদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদ, যজুবেদ ও সংহিতায় গণেশের উল্লেখ আছে। ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও গণেশ পূজা বর্তমান। রাজস্থানের অন্যতম আদিবাসী সম্প্রদায় ভিলদেরকেও চাষের পূর্বে গণেশরূপে একখণ্ড প্রস্তরকে পূজা দিতে দেখা যায়। ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে গড়িয়ারূপী গণেশের পূজা প্রচলিত আছে। এর থেকে প্রমাণিত হল যে ভারতের ধর্ম বিকাশের আদিকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সকল স্তরে সর্বত্র বিরাজমান।

এখন দেখতে হবে এই গণেশ ও মহাদেবে সম্পর্ক কি? এঁরা কি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি না একজন দুটি নামে প্রকাশমান। গণেশ নামের সঙ্গে মহাদেব, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, বিনায়ক মহাকাল প্রভৃতি নাম জড়িয়ে পড়ায় এই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ধর্ম সন্দেহাতীত ভাবে একটা বিজ্ঞান। গণেশ নামধারী একজন দেবতা একাধারে বিষ্ণু হবেন, মহাদেব হবেন বা বৃহস্পতি, বিনায়ক প্রভৃতি হবেন এটা যুক্তি গ্রাহ্য

নয়। বিভিন্ন ব্যক্তিতে গণেশ নাম প্রযুক্ত হওয়ায় স্পষ্টতই বোঝা যায় গণেশ নামটিকে গণাধিপ বা গণরাজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং এই অর্থে বিষ্ণু, মহাদেব, কপিল, বিনায়ক, বৃহস্পতি, সবাই গণপতি বা গণেশ। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ঋগ্বেদ ও সংহিতায় বৃহস্পতি ও গণপতিকে একই ব্যক্তি বলা হয়েছে। অধ্যাপক মনিয়ার বলেছেন, ''মহাভারতের স্থান বিশেষে শিবের নাম গণপতি বা গণেশ। অনুশাসন পর্বে বিষ্ণুর গণেব. পতি হিসাবে যেসব নাম দেওয়া হয়েছে তার কয়েকটি হল— গণেশ্বর, লোকনাথ। দ্রোণ পর্বে মহাদেবকে গণপতি (গণানাং পতি) উল্লেখ করা হয়েছে। আবার মহাদেবের সকল নাম বিষ্ণুর সহস্র নামের মধ্যে পাওয়া যায় যেমন ঈশান, স্থান, মহাদেব, রুদ্র, বৃষকৃতি ইত্যাদি। এসব উদাহরণ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে গণেশ ও মহাদেব ভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ গণেশ হলেন গণপতি এবং মহাদেব ও গণপতি। মহাদেবই মহাকাল। এই নামটি চীনা পরিব্রাজক ঈ-সিনের লেখায়ও পাই। ভারতের বাইরেও এই মহাকালের প্রভাব ছিল। মঙ্গোল সম্রাট আলটাইখাঁ মহাকালকে তাঁর দেশের একমাত্র দেবতা বলে ঘোষণা করেছিলেন।

আর্য অনার্য মিলনের অন্যতম সূত্র হল গণেশ ঠাকুর। আর্যরা তাঁকে বিঘ্নের দেবতা রূপেই প্রথমে উল্লেখ করেছিলেন। পরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পুরাণাদিতে, মহাকাব্যে, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে গণেশকে আর্য দেবতায় পরিণত করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। গণেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণের একস্থানে উল্লেখ আছে একা শিব থেকে গণেশের উৎপত্তি হয়েছে। আর একস্থানে আছে একা পার্বতী থেকে গণেশের উৎপত্তি হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে জন্মগ্রহণ করা মাত্রেই শনির কোপে গণেশের মাথা উড়ে গেলে বিষ্ণু একটি হাতির মাথা এনে তাঁর স্কন্ধে স্থাপন করেন। স্কন্ধ পুরাণে আছে গণেশ পার্বতীর গর্ভে থাকতে সিন্দুর দৈত্য স্কন্ধ তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করলে নারদের পরামর্শে গণেশ গজাশূরের মস্তক ছিন্ন করে আপন স্কন্ধে স্থাপন করেন।

অনার্য গণেশ দেবতা ভারত আত্মার মিলন ধর্মে আর্যদের সমাজেও সম্মানের আসন আদায় করে নিলেন। গণেশ সর্বশক্তির প্রতীক হিসাবে দেবাদিদেব মহাদেবে পরিণত হলেন। বিঘ্নের দেবতা গণেশ বিঘ্ন বিনাশকে পরিণত হলেন। ধানের দেবতা, ধনের দেবতা গণেশ ত্রিপুরার গড়িয়া দেবতার মধ্যেও মূর্ত হয়েছেন। তিনি সিদ্ধিদাতা গণেশ। সকল পূজার আগে তাঁর পূজার ব্যবস্থা। তেত্রিশ কোটি দেবতা মথিত অমৃত সঞ্জাত এই মহাদেব তথা গণেশ বা গড়িয়া। গড়িয়া ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক, সমন্বয়ের মহাদেবতা।

জীবন ও জীবিকার প্রতীক গড়িয়া সংস্কৃতি

দীপক ভট্টাচার্য

কোন জাতি বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আলোচনা করতে হয় সেই জাতির বা গোষ্ঠীর জীবন জীবিকার কথা। সংস্কৃতির প্রাণ প্রবাহের উৎস স্থল হলো জীবন ও জীবিকার পদ্ধতি। আদিমানুষ যখন কৃষিকাজের বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারেনি, তখনও তাদের মধ্যে একটা সংস্কৃতি ছিল। আমরা যারা বর্তমান সভ্যতার চরম শিখরে দাঁড়িয়ে আমাদের আদি মানুষের সংস্কৃতিকে বিচার করে থাকি তখন আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না "ভলগা থেকে গঙ্গার" প্রবাহকে মস্তিষ্কে ধরে রাখা। ফলে আমরা 'সুপিরিয়ারিটি কমপ্লেক্সে' ভুগে থাকি। অথচ এই আদিমানুষের সংস্কৃতিতে কোন কৃত্রিমতা ছিল না, সংস্কৃতি অনুশীলনে ছিল অকৃত্রিম আন্তরিকতা যার অভাব আমাদের মধ্যে দেখা যায়। আদি মানুষের সংস্কৃতি অনুশীলনে আধুনিক মানুষের ফরমালিটি ছিল না। তার কারণ কি? তার কারণ হলো জীবন জীবিকার সংগ্রামের পাশাপাশি অবসর বিনোদনের সুযোগ ছিল না। প্রকৃতির সাথে অবিরাম সংগ্রামই ছিল জীবন পদ্ধতি। পরাজয় বা সংগ্রামে দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে প্রকৃতির উপাদানকে যেমন তুষ্টি বিধানের কাজ করা হতো তেমনি ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও সম্পদ আহরণের জন্য প্রকৃতির ক্রিয়াকর্ম উপাদানকে অগ্রিম তুষ্টিবিধানের কাজ করা হতো, আর এই কাজকেই আধুনিক মানুষ বলে পূজা। অতীতের ইতিহাসে এই কাজ যাদু বা ইন্দ্রজাল নামে ভূষিত হতো। এই ইতিহাসেই আমরা দেখতে পাই জীবন জীবিকার পদ্ধতিগত ক্রিয়া শৈলী শুধু উৎপাদনের ভূমিকায় অবদান রাখেনি, এই ক্রিয়াশৈলীর প্রভাব ছিল আদিমানুষের গোষ্ঠীগত জীবনে। তাই দেখা যায় শিকার ধরে অগ্নি দেবতার পূজা। এই পূজাতে যে মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তা হলো এই যে অগ্নিকে তুষ্ট করলে সে তাদের বনে পাহাড়ে হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে যেমন রক্ষা করবে তেমনি আগামী দিনে শিকার সম্পদের বৃদ্ধি করবে। আশ্চর্য, আধুনিক মানুষ অনেক কিছু আচার অনুষ্ঠান সংস্কৃতির জগৎ থেকে বিদায় দিয়েছেন কিন্তু পারেননি বিদায় দিতে আদিমানুষের মানসিকতা। উৎপাদন পদ্ধতির ক্রম পরিবর্তনে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ কৃষি প্রথায় এসে জমির পূজা বৃক্ষের পূজা

জীবজন্তুর পূজা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূজা ইত্যাদি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই আধুনিক সভ্যতার যুগেও যদি গ্রামেগঞ্জে অনুসন্ধান করা যায় তবে দেখা যাবে বহু সম্প্রদায়ের মানুষ আজও প্রকৃতির পূজো করছেন। বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে এই মাত্র সেদিন যে মনসা বা বিষহরি পূজা হয়ে গেল তাও প্রকৃতি পূজোর একটা অঙ্গ বটে। অর্থাৎ আধুনিক মানুষ সব কিছু ছেড়েও আদিমানুষের ভাবের এক সরলরেখায় দণ্ডায়মান। অন্তত ভাববাদীদের ক্ষেত্রে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

আদি মানুষের বংশধরগণ যারা আজো পাহাড়ে বনে জঙ্গলে প্রকৃতির কোলে জীবনধারণ করছেন তাদের জীবন জীবিকার পদ্ধতি নির্ভর সংস্কৃতি এখনও বিরাজ করছে। প্রকৃতির উপর অতিপ্রাকৃতিক শক্তি আরোপ করে জীবন-পদ্ধতি পরিচালনায় যারা সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটিয়েছে বনে পাহাড়ে তারা তাদের সংস্কৃতিতে সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি না আনতে পারলেও তাদের সংস্কৃতি ও জীবন ধারা বিচ্ছিন্ন নয়। তাদের জীবন জীবিকার পদ্ধতির সাথে যারা পরিচিত নন, তারাও সংস্কৃতির অনুশীলনে জীবন জীবিকার পদ্ধতিকে ধরতে পারেন যা কৃত্রিমতাপূর্ণ আধুনিক মানুষের সংস্কৃতিতে ধরা যায় না। বিশেষত বাঙালির সার্বজনীন দুর্গা পূজা থেকে আর যাই হোক জীবন জীবিকার পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেমন পাওয়া যায় ত্রিপুরী সংস্কৃতি গড়িয়া পূজায়।

সংস্কৃতিতে জীবন ধারার পদ্ধতি সম্পৃক্ত হয়ে আছ যে অনুন্নত জাতির ক্ষেত্রে, সেই অনুন্নত জাতির সংস্কৃতির চেহারায় শৈল্পিক বোধ উপলব্ধি করা তাদের পক্ষে কঠিন হয় যাদের সংস্কৃতিতে জীবন জীবিকার সম্পর্ক ঘুচে গেছে। তারা উন্নত জাতির হিসাবে সংস্কৃতিতে শুধু শিল্প ও কাব্যরসের আধার বলে মনে করেন। এইরূপ প্রচারকার্যের ফলে জাত্যভিমানী হওয়ার সুযোগ ঘটে। অতএব তাদের দৃষ্টিতে ত্রিপুরীদের গড়িয়া পূজায় দেবতার অঙ্গে মনুষ্যাকৃতির মতো কোন অঙ্গ সৌষ্ঠব ধরা না পড়লে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা যদি দেখা দেয় তবে এটা অস্বাভাবিক মনে হবে না বটে, কিন্তু অস্বাভাবিকতা তখনই দেখা দেবে যখন কাঠামে খড়ের বিচালীতে কাঁচামাটি আর রং মিশ্রিত মনুষ্যাকৃতির দেবীমূর্তি গড়ে তোলার কষ্টকল্পনাকে অস্বীকার করা হবে পৌরাণিক কাহিনী বা মন্ত্রের নামে। এমনি করে দেবী মূর্তি গড়ে পূজা করার মধ্যে যদি অস্বাভাবিকতা না থাকে, তবে বাঁশের কঞ্চিতে দেবতার মূর্তির কল্পনার মধ্যেও কোন অস্বাভাবিকতা থাকে না, যেমন ত্রিপুরীদের গড়িয়া পূজার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

আসলে ঘটনাটা এখানে নয়। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নেয় নিজ সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠত্বের মানসিকতা থেকে। একেই বলে জাত্যভিমানী চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারা সংস্কৃতিকে একটা গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখলে সংকীর্ণতা দেখা দিতে বাধ্য। আবার অনুরূপ জাত্যভিমানী চিন্তাধারার প্রভাবে উগ্র জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি যদি সংস্কৃতিতে নেমে আসে তবে সেই সংস্কৃতিতে দেখা দেবে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। এর পাশাপাশি অথচ সতেজ সজীব সংস্কৃতির অন্তর্ধান ঘটা অসম্ভব নয়। তাই অনুন্নত জাতির সংস্কৃতির বিপদ বাইরে অবস্থান করছে। এই বিপদ সম্পর্কে তাদেরই বেশি ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার যারা উন্নত প্রগতিমূলক সংস্কৃতিচর্চায় ব্রত নিয়েছেন। অনুন্নত জাতির জীবন জীবিকার গ্যারান্টির জন্য সংগ্রাম ও প্রগতি চর্চার ক্ষেত্রে সামিল করার সংগ্রাম — এই দুই সংগ্রামের দায়িত্ব সর্বকালেই উন্নতজাতির প্রগতিশীল কর্মীদের কাঁধেই বর্তেছে। সেই দায়িত্ব আমাদের বহন করতে হবে।

কালিয়া গড়িয়া পূজার উৎস-সন্ধানে

জগদীশ গণচৌধুরী

ত্রিপুরার লোক-সংস্কৃতির আদিরূপ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তথ্যের অপ্রাচুর্য এর প্রধান অন্তরায়। সুদূর অতীতে এসব লোকাচারের রূপ কেমন ছিল তা তৎকালে কেউ লিখে যায় নি। ফলে অনুমান নির্ভর আধুনিক জল্পনা কল্পনা কতটা সঠিক হবে সন্দেহের অবকাশ আছে।

সারা পৃথিবীর লোকাচার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে বহু ক্ষেত্রেই লোকসংস্কৃতি বিবর্তিত হয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। কোথাও কোন প্রথা শুষ্কাচারে এসে ঠেকেছে, কোন আচার শুকিয়ে বিলুপ্ত হয়েছে। আবার কোন পার্বণ মূল লক্ষ্য থেকে অনেকখানি সরে গেছে। গৌণ উদ্দেশ্যই ক্রমে মুখ্যভাবে পরিণত হয়েছে। বঙ্গদেশে অনুষ্ঠিত শিবের গাজন এমন একটি উৎসব। আদিতে এটা ছিল সূর্য-পূজা। বর্তমানে শিবের পূজায় রূপান্তরিত। গড়িয়া পূজোর ক্ষেত্রেও এধরনের রূপান্তর অসম্ভব নয়।

সামগ্রিক সংস্কৃতির অঙ্গ হল ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার। সমগ্রের মতো এই অঙ্গের বিবর্তন হয়েছে। গোড়াতে মানুষ বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হিসাবে পূজা পার্বন করত। ত্যাগ, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য, সংযম, ব্রহ্মচর্য, সেবা, পরহিত প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শের আগমন দীর্ঘ বিবর্তনের ফল। এইসব মহান আদর্শের অনুভূতি ও আচরণ সব সমাজের ও সম্প্রদায়ের মধ্য যুগপৎ আসে না। পঞ্চনদের তীরে যখন বেদ উপনিষদ লেখা হচ্ছিল, তখনও ইউরোপীয়রা বন্য যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত।

জনবিস্ফোরণ ও জটিল-কুটিল রাজনীতির ফলশ্রুতি হল আজকের দাঙ্গা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। এই পরিপ্রেক্ষিতে গড়িয়া উৎসবকে জাতীয় সংহতির অন্যতম ধারক বাহক হিসেবে চালানোর একটি প্রবণতা ১৯৮০ সালের পর থেকে দেখা যাচ্ছে। অতীতের ঔষধ আধুনিক প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হতে চলেছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, অনেক, অনেক আগে সমাজের সমস্যার রূপ ছিল ভিন্ন ধরনের। ভূমির স্বল্পতাজনিত কোন সমস্যা তৎকালের আধিবাসীদের চিন্তায় ছিল না। জমি যে সম্পত্তি হতে পারে তা ছিল কল্পনার বাইরে। ভূমি নিয়ে প্রতিযোগিতা,

মারপিট, সার্বভৌম অধিকার-বোধ ইত্যাদি অনুপস্থিত ছিল।

শুরুতে গড়িয়া উৎসবের উদ্দেশ্য নিছক মেলা-মেশা ও নাচ-গান করে আনন্দ লাভ ছিল না। মূল উদ্দেশ্য কি ছিল তা উদ্ধার করার দুটো সূত্র হলো — দেবতাদের নাম ও পূজার কাল বিচার। এ উৎসবে বহু দেবদেবীর পূজা হয়, কিন্তু কালিয়া ও গড়িয়া নামক দু'জন দেবতাকে প্রধান আসন দেয়া হয়। কালিয়া বা কালো দেবতা অশুভ অপদেবতার দ্যোতক। গড়িয়া বা সাদা দেবতা শুভ দেবতার দ্যোতক। যে ঋতুতে পূজা হয় তা ঋতু চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ মহামারীর আকারে দেখা দিত তৎকালে। চিকিৎসার সুব্যবস্থা ছিল না। অসহায় লোকজন দেব নির্ভর ছিল। তারা বিশ্বাস করত এসব রোগের পশ্চাতে দৈব শক্তির হাত আছে। সেজন্য এখনও শীতলা দেবীর পূজার প্রচলন আছে। কালিয়া এমনি একজন দেবতা যাকে পূজা দিলে মহামারীর প্রকোপ কমবে বলে বিশ্বাস ছিল।

গড়িয়া দেবতাকে পূজার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষেতের ফসল বৃদ্ধি। পৌষ মাঘ মাসে শুরু হয় জুমের বন কাটা। চৈত্র মাসের মধ্যে শস্য বীজরোপনের কাজ শেষ করা বাঞ্ছনীয়। ঋতুচক্রের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষি কাজ সম্পন্ন না করলে ফসল কম হয়। পূর্ব ভারতের ভৌগোলিক স্থিতি অনুসারে পাহাড়ি-বাঙালি সকলের চৈত্র মাসের মধ্যেই কৃষি কাজের একটি বড় পর্ব সম্পন্ন করতে সচেষ্ট হয়। বৈশাখ থেকে তারা থাকে বৃষ্টির আশায়। রোগ নিদান যেমন আদিমানবের একটি বড় সমস্যা, কৃষিজাত ফসল পাওয়াও ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছিল। এদুটো জটিল সমস্যায় সারা পৃথিবীর মানুষ যুগ যুগ ধরে চিন্তিত। বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে এর মোকাবিলা করা হয়েছে। ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশের আদিবাসীরা বিভিন্ন ধরনের ভাবনা কাজে লাগিয়েছেন। সচল জীবের ক্ষেত্রে যেমন স্ত্রী পুরুষের মিলনের দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ঘটে, তেমনি অচল গাছপালা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মনে করা হল সূর্য পিতাস্বরূপ, ধরিত্রী মাতা স্বরূপা। তাই সূর্যের ও বসুমতীর পূজার প্রচলন। মানুষের বংশ-বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে কোথাও কোথাও যৌন ক্রিয়ার অনুকরণে যৌন ভাবমিশ্রিত নাচ গান চালু করা হল।

বঙ্গদেশে অনুষ্ঠেয় শিবের গাজন কিন্তু শিবের পূজা নয়। সূর্য ও বসুমতীর মিলনোৎসব। উর্ব্বরতার বৃদ্ধিবাদ। মানুষের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। আসল উদ্দেশ্য থেকে সরতে সরতে এখন নিছক মহাদেবের পুজোয় এসে ঠেকেছে।

তেমনি রূপান্তর হয়েছে কালিয়া-গড়িয়া পূজার। চিকিৎসার ও কৃষিকাজের প্রভূত উন্নতির ফলে আদিকারণ ও প্রতিকার থেকে সরে এসে নেহাত অনাবিল আনন্দোৎসবে পরিণত।

কালিয়া ও গড়িয়া পুজোর পশ্চাতে ছিল এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের পরিকল্পনা। রথ দেখা ও কলা বেচা। পক্ষান্তরে কের পুজোর উদ্দেশ্য ছিল একক। রোগের আক্রমণ ঠেকাতে গ্রাম বন্ধন। কের-এর মধ্যে আছে সংযম, কঠোর শৃঙ্খলা, নীরবতা, গোপনীয়তা। অপরপক্ষে, গড়িয়া হাসি, তামাসা, নাচগান, মেলা-মেশা। উভয় উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য সমগ্র সম্প্রদায় ও সমাজের কল্যাণ কামনা। উভয়ই বারোয়ারী উৎসব। কিন্তু আদি-ভাব থেকে কিছুটা সরে এসেছে। সমতল আসামের বড়ো কাছাড়ি সমাজের মধ্যে কের উৎসব কেরাই উৎসব নামে পরিচিত।

বাংলার মঙ্গল কাব্য ও গাজনগীতির সঙ্গে আধুনিক গড়িয়া গানের ভাবগত সাদৃশ্য আছে। এই ত্রিধারা সংসার আসক্তির জয় গান করেছে। গৃহ ও পরিবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি স্বরূপ। সংসার কেন্দ্রবিন্দু। পার্থক্য দেখা যায় বৈষ্ণব সাহিত্যের ও দর্শনের সঙ্গে। বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শন ইহজগতের প্রতি উদাসীনতা দেখিয়েছে, সংসারের অসারতা ও অনিত্যতা প্রমাণ করতে চেয়েছে। অপরপক্ষে, মঙ্গলকাব্য, গাজনগীতি ও গড়িয়া গীতির সারকথা, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' সংসারের শত অভাব অভিযোগ অশান্তি আছে জেনেই তাদের প্রতিকার করে এর মধ্যেই ডুবে থাকতে চায়। ফলে, এই ত্রিধারাকে বলা হয় বিষয়াবদ্ধ সংসারী জীবের সুখ দুঃখের অভিব্যক্তি। তবে সাহিত্যিক মানের বিচারে মঙ্গলকাব্য ও গাজনগীতির তুলনায়, গড়িয়া গীতমালা অনেক পিছিয়ে আছে। এত পিছিয়ে যে মঙ্গলকাব্য ও গাজন গীতিকে যদি সাবালক বলা হয়, তবে গড়িয়া গীতি ভ্রূণের স্তরে রয়ে গেছে। এর কারণ একাধিক। ত্রিপুরী সমাজের নিরক্ষরতা ও সংঘাতের স্বল্পতা মুখ্য কারণ।

গড়িয়া পূজা ও বাংলা নববর্ষ

মহেন্দ্র দেববর্মা

ত্রিপুরা রাজ্যের জুমিয়াদের দেবতা শ্রীশ্রীগড়িয়া পূজা ও বাংলা নববর্ষ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে বলা যায় এই দুটি বিষয় পরস্পর ভিন্ন তাৎপর্যমণ্ডিত।

শ্রীশ্রীগড়িয়া বোধন হয় মহাবিষুর উষা লগ্নে, বিসর্জন হয় ৭ই বৈশাখ সায়াহ্নে। আর বাংলা নববর্ষারম্ভ হয় ১লা বৈশাখ সিদ্ধিদাতা গণেশ দেবতাকে পূজা দিয়ে। জমিদার বা মহাজনদের শোষণের হিসাব-হালখাতা বা নূতন খাতা খোলার উৎসবটা এ দিনের বিশেষ তাৎপর্য।

জুমিয়ারা গড়িয়া দেবতার পূজা দেয় জীবনের জন্যে, সমৃদ্ধির জন্যে, জুমে ভাল ফসল ফলনের জন্যে, বর্ষটা সুখে শান্তিতে অতিবাহিত হওয়ার জন্যে। 'গড়িয়া উছাক' মানে গড়িয়া দেবতার প্রতীকটি পবিত্র কিশোর বাঁশ কেটে এনে প্রতীক বানানো হয়। মহাবিষুর সংক্রান্তি দিনে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায় যে, পুরাতনবর্ষ ও নববর্ষের সীমানার মধ্যে যেন খুঁটি পোঁতা। পুরানো এবং নতুন বছরকে যেন চিহ্নিতকরণ আর কি। মহাবিষুর দিনে হিন্দুরা বছর শেষে পিতৃপুরুষ ও মাতৃপুরুষকে জল দান করে থাকেন। জুমিয়ারা তেমন কোন ক্রিয়াকর্ম করেন না। এদিনে বর্ষ দেবতাই তাদের প্রধান উপাস্য। গড়িয়া দেবতাকে বর্ষ দেবতা বলা যেতে পারে।

জুমিয়াদের নতুন বছর সাধারণত নতুন জুম কাটার মাস অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসকেই ধরা যায়। তাই বলছিলাম বাংলা নববর্ষ ও গড়িয়া পূজা উৎসব এক নয়। বিহু, বিজু ও অন্যান্য জুমচাষীদের বৈশাখী উৎসবগুলি সমান তাৎপর্যপূর্ণ।

জুমিয়াদের গড়িয়া পূজার সঙ্গে জুম চাষের নিবিড় সম্পর্ক। কারণ সাধারণত গড়িয়া পূজার পরই জুমের ধান রোপন করা হয়ে থাকে। তারা বলে 'চইতর' হুগ ছকয়া উারেংছা খাময়া, বইসাকা মায় কাটিয়া বীছা নায়য়া অর্থাৎ চৈত্রমাসে জুম না পোড়ালে বাঁশের শিকড় বাকড় পোড়া যায় না, বৈশাখ মাসে ধান না রোপণ করলে ধানের মুকুল ধরে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে ধান কখন লাগাতে হবে। জুম কখন পোড়াতে হবে তার সময় নির্দিষ্ট করা ছিল।

আবার চৈত্র সংক্রান্তি মহাবিষুর উষালগ্নে গড়িয়া দেবতার পূজা দিচ্ছেন জুমিয়ারা, মীন রাশি সেই দিন মেষ রাশিস্থ হবে। ৩০ বা ৩১ চৈত্র থেকে ৮দিন এই পূজা উৎসব চলবে। বন প্রান্তর কেঁপে উঠবে খামের তালে তালে গানি গানি গান চন্ চন্, চুগান গাগান চন্ চন্। গানি গানি গান চন্ চন্ চুগান গাগান চন্ চন্। তনুমন শিহরিত হবে খেরেবাই নৃত্যশিল্পীদের 'ফায়লাহাদ্যে গড়িয়া মছা ফায়দি বা বাড়িয়া' আহ্বানে। এইভাবে নৃত্য গীত, পান ভোজনের মাধ্যমে অতিবাহিত হবে ৮দিন। গড়িয়া দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে শ্রান্তক্লান্তদেহের আলস্য ঝেড়ে ফেলে ধান রোপণের কাজে লেগে যায় জুমিয়ারা।

এদিকে জুম পোড়ানোর ছাই জুমের সার হিসাবে কাজ করবে। বৈশাখী বারি ধারা পাহাড়ের গেরুয়া রুক্ষ মাটি ভিজিয়ে দেয়। জুমিয়াদের মনে সোনার ফসলের আশা জাগায়। এই জুমে তারা সারা বছর পেট ভরে খেতে পায় না। তাই জুমিয়া কবি দুঃখ করে গেয়ে ওঠেন বিছি সাঁপুংগাঁই তাংছিনি তাংগাঁই বহকছে পুংলাংলিয়া মানে জুমকে ৭ বার পরিষ্কার করতে হয়। এই হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরও পেট ভরে না। কেন? জীবনের এই জিজ্ঞাসা থেকে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে পূজার্চনার পরিকল্পনা করেছিল সেই দিনের মানুষ। প্রাকৃতিক ঘটনা দুর্ঘটনার পেছনে হয়তো কোন দেবদেবীর হাত আছে, নয় তো অঘটন ঘটবে কেন?

কাজেই এদের দেবদেবীর সঙ্গে হিন্দুধর্মের দেবদেবীর মিল খোঁজাটা অযৌক্তিক। ত্রিপুরীদের দেবদেবী তাদেরই কল্পিত দেবদেবী, অন্য কোন ধর্মের ধার করা দেবদেবী নয়।

ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতায় ত্রিপুরা তথা ভারতের সমগ্র খণ্ড জাতি গিরিজনদের সাংস্কৃতিক অবদানের তথ্য আবিষ্কৃত হলে সত্যিকারের জাতীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হবে। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার উন্নত রূপান্তরই হবে প্রকৃত ভারতীয় সংস্কৃতি। জাগাবে এক প্রাণ একতার মনোভাব। আর্য সংস্কৃতি, সিন্ধু সংস্কৃতির নামে যাঁরা শ্রেষ্ঠ বলে গর্ববোধ করেন, তাঁদের সেই উচ্চমান্যতা দূর হয়ে আমরা ভারতীয় একই সভ্যতার উত্তরাধিকারী — এই দৃঢ় মনোভাব জাগবে।

এবার 'কাঁচুক হা সিকাম কা-মানি মানে 'উচ্চ কুকি ভূমি আরোহণ'-এর ইতিহাসটি বলে এ প্রবন্ধ শেষ করবো ঃ এই ইতিহাসে গড়িয়া দেবতার ত্রিপুরায় আগমনের প্রচলিত উপকথা জড়িত। ইতিহাসটি হচ্ছে মহারাজ ধন্যমাণিক্যের আমলে সেনাপতি রায় কাঁচাক রায় কসমের নেতৃত্বে কুকি দেশ জয়। আর কিংবদন্তী

উপকথাটি হচ্ছে এরূপ কালাইয়া গড়িয়া দুই ভাই, কুকি দেশের রণ দেবতা। কথিত আছে রণ দেবতাকে পূজা দিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করলে, জয় সুনিশ্চিত। এই দেবতা মন্দিরে যুদ্ধাস্ত্র সব মজুত থাকে। যুদ্ধে যাওয়ার সময় এখান থেকে যে যায় অস্ত্র নিয়ে যায়।

কালাইয়া গড়িয়ার বড় ভাই। গড়িয়া ছোট ভাই হলেও সেই বেশী শক্তিমান এবং জাগ্রত। এ কারণেই প্রথমে অর্থাৎ হারিবিষুর দিন কালাইয়ার পূজা হয়। গড়িয়ার পূজা হয় মহাবিষুর দিন। তাই এ পূজার অপর নাম বিসু সেনা। 'বিসু সেনা'কে বাংলা করলে দাঁড়ায় বিসু মানে গড়িয়া দেবতা আর সেনা মানে স্থান পরিবর্তন করা। এই দিনেই গড়িয়া দেবতা কুকি দেশ ছেড়ে ত্রিপুরায় এসেছিলেন।

কথিত আছে, একদা ত্রিপুরার মহারাজা ধন্যমাণিক্যকে গড়িয়া দেবতা স্বপ্নে আদেশ করে বলেছিলেন — 'তুই আমাকে তোর রাজ্যে নিয়ে যা। আমি কুকি দেশে আর থাকবো না। ওরা ম্লেচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। অখাদ্য খায়। নর হত্যা করে। আমাকে আগের মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করে না। যে সমাজে অনাচার অত্যাচার প্রবেশ করেছে সেখানে থাকবো না। তোমার দেশে যাবো।'

স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মহারাজ ধন্যমাণিক্য তাঁর সেনাপতি রায় কচাক ও রায় কসমের নেতৃত্বে ত্রিপুরার রাজা বিরাট সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন কুকি দেশ জয় করে গড়িয়া দেবতাকে নিয়ে আসার জন্যে। ঐ সৈন্য বাহিনীতে ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং, নোয়াতিয়া, কলই, রূপিণী এবং অন্যান্য সব হদার লোক ছিল। চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ত্রিপুর বাহিনী কুকি রাজ্যের থানাংচিগড়ের পাদদেশে পৌঁছলো। কুকি সৈন্যগণ পাহাড়ের উপর থেকে পাথর, বর্শা, তির ছুঁড়ে ত্রিপুর বাহিনীকে ঘায়েল করতে থাকে। পাহাড়ের নিচু থেকে কিছুই করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় হয়তো গড়িয়া বাবার ইচ্ছাতেই একটি গো-সাপ দেখা গেল। সেনাপতিদ্বয় যুক্তি করে ঐ গোসাপের কোমরে দীর্ঘ শক্ত মোটা দড়ি বেঁধে পাহাড়ের উপরে ছুঁড়ে দিল। কয়েকদিন নীরবে কাটালো। কুকি সৈন্যরা মনে করলো ত্রিপুর বাহিনী পরাস্ত হয়ে চলে গেছে। পান ভোজনে তারা মত্ত হয়ে রইলো। এদিকে ত্রিপুর সৈন্যরা ঐ দড়ি ধরে টেনে পরীক্ষা করলো দড়িটা আটকেছে কিনা। দেখা গেল দড়ি কোথাও শক্ত ভাবেই বাঁধা পড়েছে। তারপর আর কি একে একে সবাই ঐ রশি বেয়ে উপরে উঠলো এবং অতর্কিতে আক্রমণ করে কুকি সৈন্যদের পরাজিত করলো। লুটপাট চালালো। গড়িয়া দেবতা মন্দির লুট করার সময় জমাতিয়া সৈনিক সোনার মূর্তি পায় এবং অন্যান্য হদার সৈনিকরা বর্শা, তলোয়ার গংবাদ্য

ইত্যাদি হস্তগত করে। যুদ্ধবন্দি বন্দিনি নিয়ে বিজয় গর্বে ত্রিপুর বাহিনী দেশে ফিরে আসে এমনি মহাবিষুর শেষ রাতে। সাত দিন চলে এই বিজয় উৎসব সারা ত্রিপুরায়।

কুকি ও ত্রিপুরীদের এই যুদ্ধের ইতিহাসকে কেউ কেউ শ্বেতহস্তী নিয়ে যুদ্ধের ইতিহাস বলে থাকেন। সে যাই হোক, মহারাজ ধন্যমাণিক্য গড়িয়া দেবতার মূর্তিটি যেহেতু জমাতিয়া হদা সৈন্যরা এনেছে তাদের হেপাজতে রাখার ও পূজা করার ভার অর্পণ করেন। অন্যান্য হদা সৈন্যরা গড়িযা দেবতার যে যে অস্ত্র এনেছিল, সেই অস্ত্র তারা পূজা করে। ধন্যমাণিক্যের আমল থেকে সে ভাবে গড়িয়া পূজা হয়ে আসছে, আজও হচ্ছে।

সমাজ বিবর্তনের আলোকে গড়িয়া সংস্কৃতি

সুরেন দেববর্মন

গড়িয়া পূজা ও গড়িয়া নৃত্য এ রাজ্যের সকল মানুষের কাছে সুপরিচিত ত্রিপুরী ও অন্যান্য ককবরকভাষী সমাজে গড়িয়া দেবতা গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে পূজিত হয়ে আসছে সুদূর প্রাচীনকাল থেকে। গড়িয়া দেবতা ত্রিপুরী সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে সুখ-সমৃদ্ধি ও মঙ্গলের প্রতীকরূপে। চৈত্র সংক্রান্তি ও বাংলার নববর্ষ উপলক্ষে গড়িয়া দেবতাকে নিয়ে একজন পূজারী ও নাচিয়ে দল গ্রাম পরিক্রমা করে গড়িয়া দেবতার পূজা ও আশীর্বাদ দানের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। ভক্তিমান গ্রামবাসী গড়িয়া দেবতার সাক্ষাৎ লাভে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে নিজেদের ধন্য ও পুণ্যবান বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাস গড়িয়া দেবতার আশীর্বাদ লাভে সুখ সমৃদ্ধি লাভ করা হয় — জুম ফসল বৃদ্ধি হয়। বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভে গড়িয়া দেবতার পূজা প্রচলনের সঙ্গে জুমিয়া কৃষিজীবীদের ফসল দেবতা বা কৃষি দেবতার পরিকল্পনা নিবিড় ভাবে সংযুক্ত। সুতরাং গড়িয়া দেবতার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনার সময় জীবিকার সমৃদ্ধি কামনাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য গড়িয়া দেবতার পূজা উদ্‌যাপন মুখ্য বিষয়। তবে পূজা উদ্‌যাপনের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনার প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে। সকল দেবদেবীর পূজার প্রাঙ্গণে পূজা উদ্‌যাপনের পাশাপাশি নৃত্যের সংযোজন চোখে পড়ে। মন্দিরে বা দেবীর দেউলে যে নৃত্য পরিবেশিত হয় তার প্রতিশব্দ নৃত্যের পরিবর্তে 'আরতি' অভিধায় প্রচলিত।

আদিযুগে গড়িয়া দেবতা হয়তো বা ত্রিপুরীদের নিজস্ব দেবতা ছিল। কিন্তু প্রতিবেশী বঙ্গীয় (পূর্ববাংলা) সমাজ ও ধর্মীয় প্রভাবের ফলে ত্রিপুরী সমাজে আর্যায়নের বাতাবরণ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যাওয়ায় গড়িয়া দেবতাকে হিন্দু দেবকুলের সমগোত্রীয় বলে কল্পনা করা হয়েছে অতি আধুনিক যুগে। ফলে গড়িয়া দেবতা কল্পনায় বিবর্তন ও রূপান্তর অপ্রত্যাশিত নয়। সনাতন হিন্দু ধর্মীয়ভাবনা ও অনুভাবনাতেও এহেন বিবর্তন বিরল নয়। কিন্তু এতে দেব মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

গড়িয়াদেবতা কল্পনা রূপান্তরের জন্য দায়ী ত্রিপুরী সমাজের প্রতিবেশী বঙ্গীয় সমাজ ও ধর্মের প্রভাব। একে অস্বীকার করা যায়না।

সমাজ বিবর্তনের সিংহাবলোকনে হয়তো বা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে আদিকালে ত্রিপুরী সমাজ হিন্দু সমাজে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এরা চীন দেশীয় মঙ্গোল জাতির একটি শাখা। হাজার হাজার বছর আগে নিজভূমি চীন দেশ থেকে তিব্বত ও ব্রহ্মদেশ অতিক্রম করে ভারত ভূমিতে প্রবেশ করেছিল। বর্তমানে উত্তরপূর্ব ভারতে বসবাসকারী সমস্ত আদিবাসী সমাজ মঙ্গোল জাতির বংশধর। এই মানব গোষ্ঠীভূক্ত হয়েও এরা এখন ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন বেশ ভূষায় অনন্য বৈশিষ্ট্যে অনন্ত বৈচিত্র্যের প্রবাহে প্রবহমান। চীনদেশের কোন পরিচয় চিহ্ন এরা রক্ষা করতে পারেনি। ভারত ভূমিতে এসে ভারতের বিভিন্ন সমাজগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। কিছুটা গ্রহণ ও কিছুটা বর্জনের সুষম নীতির মাধ্যমে। ফলে, ত্রিপুরী সমাজ কোন শতক থেকে সনাতনী হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী হয়েছিল তার কাল নির্ণয় করা কঠিন। তাইতো দেখি ত্রিপুরী সমাজে সর্বপ্রাণবাদ ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি সনাতনী হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ত্রিপুরীদের অবিচল বিশ্বাস ও সুগভীর ভক্তি।

ধর্ম, ভাষা ও সমাজ সংস্কৃতির জীবনে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ আজকের পরিবর্তিত ত্রিপুরী সমাজ। ত্রিপুরা রাজ্য এবং বাংলা দেশের চট্টগ্রাম জেলায় বসবাসকারী ত্রিপুরী সমাজ, উত্তর বঙ্গের রাজবংশী ও কোচ জাতি আসামের কাছাড়ী, দিমাছা, অথবা বৃহত্তর বোড়ো জনগোষ্ঠীর রূপান্তরিত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবয়বে বাইরের প্রভাব সুস্পষ্ট। মঙ্গোল জনগোষ্ঠীর সমাজ দেহে সনাতনী হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস কিভাবে অনুপ্রবিষ্ট হলো সেই প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত সহজ। ত্রিপুরী, রাজবংশী, কোচ ও বোড়ো কাছাড়ীর জনগোষ্ঠীর শতাব্দীকাল ব্যাপী বঙ্গদেশীয় জনগণের পাশাপাশি বসবাস করার ফলে মঙ্গোল জনগোষ্ঠীর হলেও এদের মানসলোকে হিন্দু দেব দেবীর প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটেছে। সমাজ বিপ্লব অথবা সমাজ মিশ্রণের প্রক্রিয়ায়।

তাই ত্রিপুরী সমাজে পূজিত গড়িয়া দেবতা আর্য সমাজে পূজিত (Aryan Society) শিব ঠাকুর অথবা সিদ্ধিদাতা গণেশের সমতুল্য দেবতা বলে পরিগণিত হয়। ত্রিপুরী এবং ককবরক ভাষী সমাজে গড়িয়া দেবতা আর্য সমাজের পরম পিতা ব্রহ্ম বা দেবাদিদেব মহেশ্বর বলে পরিকল্পিত। ককবরক ভাষায় গড়িয়া দেবতাকে মীতাই কতর বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই মীতাই কতর হিন্দুদের শিব দেবতার সমতুল। পক্ষান্তরে গড়িয়া দেবতা সুখ সমৃদ্ধির দেবতা। তাই ভাষান্তরে ধনের দেবতা বলেও অভিহিত। সুতরাং ত্রিপুরী সমাজের ধর্মীয়

অনুভাবনা হিন্দুধর্মের দেবদেবীর ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। আর্য সমাজে শিবঠাকুর কৃষির দেবতা বলে পরিগণিত। অপরপক্ষে সিদ্ধিদাতা গণেশ ধন ও সমৃদ্ধির দেবতা বলে পরিগণিত। ত্রিপুরীসমাজে গড়িয়া দেবতার বিষয়ে ধর্মীয় অনুভাবনার সঙ্গে সনাতনী হিন্দু ধর্মের ভাবনার সাজুয্য চোখে পড়ে। এতো গেল দুটি সমাজের পরস্পর মিশ্রণের স্বাভাবিক পরিনতির দিক।

কিন্তু তবু একথা জিজ্ঞাস্য থেকে যায়, ত্রিপুরী সমাজের আবির্ভাবের উষালগ্নে অর্থাৎ প্রাক অর্যায়ন যুগে গড়িয়া দেবতা কি নিছকই আদিম বা ঐন্দ্রজালিক পূজা পার্বণ ও নৃত্যরূপ নিয়ে ত্রিপুরী সমাজে উদ্ভূত হয়েছিল?

সেই প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখা মেলা দুষ্কর। তবু লোকশ্রুতি ও প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে গড়িয়া দেবতার যে অনুমানিক পরিচয় পাওয়া যায়, এতে অনুমান করা চলে যে, গড়িয়া দেবতা ত্রিপুরী সমাজে খুব সুপ্রাচীন পূজিত দেবতা নয়। রাজমালায় বর্ণিত আছে পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজা ধন্যমাণিক্যের আমল থেকে গড়িয়া দেবতার পূজা প্রচলন হয়। কোন কোন গ্রন্থকার গড়িয়া দেবতাকে রণের দেবতা বলেও বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন কালের রাজন্যবর্গ নাকি যুদ্ধবিগ্রহের প্রাক্‌কালে গড়িয়া দেবতার পূজা সমাপন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। তাহলে গড়িয়াকে শৌর্য ও বীর্যের দেবতা বলেও পরিগণিত হত। আবার বর্ষশেষে গড়িয়া দেবতা পূজা এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিচরণ ও নৃত্যের মাধ্যমে পূজারী বৃন্দের সুখ সমৃদ্ধির আশীর্বাদদানের ভূমিকায় অবতীর্ণ গড়িয়া দেবতাকে জুমিয়া পূজারীদের কৃষি ও ফসলের দেবতা হিসাবে কল্পনা করা হয়।

বর্তমানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে গড়িয়া দেবতার সার্বজনীন পূজা হয়। হিন্দু শিব ও গণেশের সমগোত্রীয় কিনা সেই প্রশ্ন অবান্তর। সুতরাং গড়িয়া দেবতার পরিচয় বা তার উৎসব নিয়ে প্রশ্ন করাও এ যুগে অর্থহীন।

ত্রিপুরা আদিবাসীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও তান্ত্রিক চিকিৎসা

অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা

উপজাতীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট

উপজাতীয় সমাজ, যে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সেইসব সংস্কৃতিকে, উপজাতীয় সংস্কৃতি বলা যায়।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা খুবই ব্যাপক। সংস্কৃতি একটা জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবন প্রবাহের পূর্ণরূপকে বুঝায়। জন্ম, মৃত্যু, ধর্ম বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, আইন-আদালত, সামাজিক কার্যকলাপ সকলই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। একটা জনসমষ্টি জীবিত থাকতে সমাজ ব্যবস্থা ও আইন কানুন, ধর্মীয় ব্যবস্থা যা প্রয়োজন তাই সংস্কৃতি। শুধু জীবিত অবস্থায় নয় তা মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাতেও সংস্কৃতির ধারা প্রবহমান। সংস্কৃতি ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

সৃষ্টির আদিযুগ থেকে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর লোকজীবন জীবিকার পথে বাধা বিঘ্ন ও বিপদের সঙ্গে লড়াই করে বংশ বিস্তার ও অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। পরিবেশ ও প্রাকৃতিক অবস্থা অনুযায়ী সেই লড়াই-এর রূপ ভিন্ন ভিন্ন। কোনটি বা সমতুল্য। মৃত্যু ভয়, ধর্মবিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক চিন্তাই মূল কারণ। মানুষ ইহকাল ও পরকাল, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিণাম চিন্তা করে। তাই ইহকালে বেঁচে থাকার ও পরকালে পরিণামের কথা চিন্তা করে ইহকালে সুখে বেঁচে থাকার ও পরকালে সুপরিণতির উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য কর্ম ও আচরণ অনুষ্ঠানাদি করে থাকে। এই চিন্তাধারা ও আচরণ প্রতি দেশের মানব গোষ্ঠীরই প্রায় এক বা সমতুল্য। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন আবহাওয়ায় ও বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বাস করে। সব দেশের মানুষের চিন্তাধারা প্রায় এক ও সমতুল্য। যেমন, মনুষ্যজাতি আগুনের সাহায্যে রান্না করে খাওয়ার রুচি, আগুনের ব্যবহার, আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ব্যবহার, বৎসর গণনা, মাসগণনা, দেবকল্পনা, ঈশ্বরের অস্তিত্ববোধ ইত্যাদি ভাব ও কল্পনা বিভিন্ন দেশের মানব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় একই। ইহকালে বেঁচে থাকার উপায় ও ব্যবস্থা প্রায় সমতুল্য। তাই আশ্রয়ের জন্য গৃহ নির্মাণ,

শীত-গ্রীষ্ম বা লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্রের ব্যবহার, আহারের চিন্তা, রোগমুক্তির জন্য উপায় উদ্ভাবন প্রতি দেশের মানুষের মধ্যে দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের রোগমুক্তির উপায় হিসাবে উদ্ভাবিত চিকিৎসা পদ্ধতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন ঃ

১) আয়ুর্বেদ, ২) হেকিমি চিকিৎসা, ৩) বায়োকেমিক, ৪) হোমিওপ্যাথিক, ৫) এ্যালোপ্যাথিক, ৬) হাইড্রো প্যাথিক ৭) আকুপাংচার। পর্বতবাসী উপজাতিগণ রোগমুক্তির উপায় হিসেবে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, ঐ ব্যবস্থাকে তান্ত্রিক চিকিৎসা বলা যায়। তান্ত্রিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে দেশীয় গাছ গাছড়া, লতাপাতা, শিকড় বাকড় সংগ্রহ করে ও ঔষধ তৈরি করা হয়। যা আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বা কবিরাজি চিকিৎসার অঙ্গ।

তৃণগুল্মের রস সিদ্ধ করে ঐ রস পচন নিবারণ করার ব্যবস্থা অজানা থাকায় রসায়ন জাতীয় ঔষধ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করতে দেখা যায় না। তান্ত্রিক পূজা, মন্ত্রে ঝাড়া, কবচ ধারণ ও ঔষধ ব্যবহার করাই তান্ত্রিক চিকিৎসার অঙ্গ। ধর্মবিশ্বাস সংস্কৃতির উৎস। আবার ধর্ম-সংস্কৃতি মানুষের প্রধান সংস্কৃতি। উপজাতীয় দেবধর্মে বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও রোগ নিরাময়ের জন্য অবলম্বিত পন্থা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

ধর্ম সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ

প্রতি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ ধর্ম আছে, যদি তারা নিজেদের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান বলিয়া পরিচয় দিয়ে থাকে। এইসব ধর্মের আওতার্ভুক্ত হলেও পাশাপাশি তাদের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস আছে তা সর্বপ্রাণবাদের সমতুল্য। প্রাণবাদ বা জড়বাদ ইংরেজিতে যাকে Animism বলা হয়। প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তুর অন্তরালে একটি শক্তি নিহিত আছে এবং এই শক্তির বলে তারা জীবিত থাকে। সেই শক্তিতে আস্থা জ্ঞাপনই প্রাণবাদ বা এ্যানিমিজম। টিপরা উপজাতীর লোকেরা, জল বা নদী, অগ্নি পর্বত, চন্দ্র, সূর্য, ধান, কার্পাস প্রভৃতিকে এক একটি দেবতা মনে করে। হিন্দুধর্ম সর্বপ্রাণবাদ থেকে মুক্ত নয়। তাই উচ্চতর ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক উপজাতিদের আদিবিশ্বাসসহ তাদের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মেনে নিয়েছে। চতুর্দ্দশ দেবতা মন্দিরে তিপ্রাদের যেসব দেবদেবীগণ পূজিত হয় তারা হিন্দুদেরই দেবদেবী। তবু বেদোক্ত দেবদেবীর সঙ্গে হিন্দু বলে পরিচিত উপজাতীয় দেবদেবীর নাম ও আচার অনুষ্ঠান পূজাদি এক নয়। বড়ো, মেচ, কুচ, কাছাড়ি, লালং, হাইজং, গারো প্রভৃতি উপজাতীয়দের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস এক এবং তাই সর্বপ্রাণবাদ।

তিপ্‌রাদের 'মালিখামানি' পূজাদিতে ফলবান বৃক্ষের নীচে পূজার আসন দেওয়া হয়। যে বৃক্ষের নীচে পূজা দেওয়া হয় ঐ জাতীয় বৃক্ষের ফল সন্তানের মায়েদের খাওয়া নিষেধ। ছেলে বা মেয়ে হাঁটতে না পারা পর্যন্ত ফল খেতে পারবেনা। হিন্দুশাস্ত্রে বৃক্ষ পূজার প্রচলন ব্যাপক, যেমন তুলসী, বট, অশ্বত্থ, বেল বৃক্ষাদি পবিত্র বৃক্ষ হিসেবে পূজিত। সুতরাং উপজাতীয় লোকের ধর্ম বিশ্বাসের ভাব ও কল্পনা পরবর্তীকালে মুনি-ঋষিদের ধ্যানধারণা লব্ধজ্ঞানে মিলিতভাবে হিন্দুশাস্ত্র সম্প্রসারিত ও পুষ্ট।

বেদ, পুরাণ এবং সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রে উল্লেখিত দেবদেবী ছাড়াও উপজাতীয় লোকের দেবদেবী সম্পূর্ণ পৃথক। এই দেবদেবীকে কেন্দ্র করে মন্ত্রতন্ত্র পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান উদ্ভুত হয়েছে। বেদে শিব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নেই। শুধু 'সত্যম শিবম্ সুন্দরম্' এই তিন শব্দই লিখিত। শিবকে কিরাত দেবতা বলা হয়েছে। অধিকাংশ উপজাতীয় লোকের প্রধান দেবতা শিব্রাই। বড়োদের ভাষায় 'জীউ' মানে প্রাণ। জীউব্রায় হতে শিব্রাই ক্রমে শিব্রায় শব্দ হতে শিব শব্দে রূপান্তর হতে পারে।

শিব্রাই বড়োগোষ্ঠীর জনগণের সর্বদেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতা। শিব্রাইকে 'বাথু ব্রায়'ও বলা হয়। বুড়া বাথু মহারাজা। প্রতি দেবতাকে রাজা বলে সম্বোধন করে আহ্বান করা হয়। 'রা' মানে পরিণত বয়স, 'অক্রা' ঃ বয়োজেষ্ঠ্য, 'জা' মানে পতি। রাজা মানে অধিশ্বর ও বয়োজ্যেষ্ঠ। সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন অনাদিকাল স্থায়ী অধিপতি। সেইরূপ 'রা' শব্দটি শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়বোধক। শ্রীকলাক্ষি রাজা, শ্রীমা গংগি রাজা, অনুপক্ষী রাজা, বাগবল রাজা, উড়োপক্ষী রাজা, বাবুই গড়েয়া রাজা, শ্রীবনমালী রাজা ইত্যাদি বাক্য দেবমন্ত্রে উচ্চারিত হয়ে সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সম্বোধিত হয়েছে। এসব দেবদেবীর পূজা অর্চনায়, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে, ও পরকালের বিশ্বাসকে ঘিরে যেসব গল্প, রূপকথা, গীতের মাধ্যমে উপজাতীয় সংস্কৃতি পল্লবিত হয়েছে, সেইসব ধ্যান-ধারণায় ও তন্ত্রেমন্ত্রে আজও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়বোধক 'রা' শব্দটি বহুল পরিচিত। সুতরাং বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা ও ধর্মবিশ্বাস উপজাতি সমাজ কাঠামো ও সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ।

ত্রিপুরী (তিপ্‌রা) উপজাতি লোক সমাজে প্রচলিত ও পূজিত দেবদেবী সমূহ

ত্রিপুরী সমাজে পূজিত দেবদেবী চৌদ্দটিই প্রধান। তাঁহাদের নাম (১) সুকুন্দ্রায় (২) মুকুন্দ্রায় (৩) কালেয়া (৪) গড়েয়া (৫) ইখিত্রা (৬) বিখিত্রা — এই

ছয়টি দেবতা এককভাবে পূজা পায়। (ক) সুকুন্দ্রায় - মুকুন্দ্রায় এই দেবদ্বয় যুগ্মভাবে যখন পূজিত হয় তখন এই যুগ্ম দেবতার নাম কাথারক। (খ) কালেয়া-গড়েয়া যখন যুগ্মভাবে পূজিত হয় তখন এই দেবদ্বয় বনিরক নামে পরিচিত। (গ) ইখিত্রা-বিখিত্রা এই দেবদ্বয় যখন যুগ্মভাবে পূজিত হয় তখন তাহাদের নাম থুবনাইরক। একক হিসাবে ছয়টি এবং যুগ্ম হিসাবে তিনটি। মোটা নয়টি পুরুষ দেবতা। এছাড়া আরও আছে পাঁচ দেবী। পাঁচ দেবীর নাম - (১) মাইলুংমা - ধান্য ফসলাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (২) খুলুংমা - কার্পাস ও বস্ত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (৩) তুইবুকমা অর্থাৎ জল বা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (৪) হাচুকমা পর্বতের অধীশ্বরী, দেবী পার্বতী। তাহার স্বামীর নাম বুড়াছা। (৫) সাংগ্রংমা হাতি-পাল্কী-রথ প্রভৃতি যানবাহনের দেবী। মগের ভাষায় স্যাং-মানে হাতি।

উপজাতীয় লোকসমাজে মূর্তি পূজার প্রচলন নেই। পূজা অনুষ্ঠানে পূজার আসনে দেবতার প্রতীক হিসেবে নিম্ন বর্ণিত প্রতীকগুলি ব্যবহৃত হয়। ওয়াথপ ঃ দেড়হাত পরিমিত ছয়টুকরা কাঁচা বাঁশ কেটে নিয়ে দা দিয়ে চেঁছে সোজা ও বক্র রেখা দ্বারা কারুকার্য করা হয়। চার টুকরো বাঁশ বামে একজোড়া ডাইনে একজোড়া মাটিতে লম্বভাবে এইচ-এর মত পুঁতে দেওয়া হয়। আড়াআড়িভাবে দু-টুকরো বাঁশ ঐ পূর্বোক্ত চার টুকরোর সঙ্গে এইচ-এর আকারে বাঁধা হয়। এরূপ দেবকল্পনায় অধিষ্ঠানের প্রতীককে 'ওয়াথপ' বলা হয়। একটি ওয়াথবই দেবতার প্রতীক। একটি ওয়াথপে দু'জোড়া বাঁশের টুকরোকে যুগ্ম দু'দেবের প্রতীক বোঝায়। 'দিক' রক্ত গ্রহণকারী প্রতীক। বাঁশের কঞ্চিতে পাঁচটা আঁশ তুলে নীচের অংশ মাটিতে পোঁতার জন্য সূঁচালো করে কাটা হয়। পূজাতে ছাগ, মোরগ, হাঁস, কবুতর বলি দেওয়া হয়। একটা দিক পুঁতে পূজা দেওয়া হয়। পূজাতে বলিবধ্য জীবের রক্ত উৎসর্গের জন্য ওয়াথপের সামনে দিক পোঁতা হয় ও দিক-এর নীচে কলাপাতার থালা পেতে রাখা হয়। ওয়াথপে একটা টুকরো বাঁশ দু' হাত দৈর্ঘ্যে চেঁছে কারুকার্যসহ হেলিয়ে রাখা হয়। দুটা বাঁশের চোঙা জলপূর্ণ করে রাখা হয়। ওয়াথপের বাঁ ও ডান দিকে এক্স-এর মতো আড়াআড়ি দু কঞ্চির উপর জলচোঙাগুলি রাখা হয়। এক্স-এর মতো কঞ্চিকে বলা হয় কাইতেবে। হেলানো সজ্জিত টুকরোকে বলা হয় নাগ্রি। দু'চোঙার জল দ্বারা দেবতার পা ও মুখ ধোয়ার জন্য, প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করে শুরু করা হয় পূজা।

'খং' -একটা কাঁচা বাঁশের কঞ্চি এক বিঘত দূরত্বে কারুকার্য করে দিক-এর গা ঘেঁষে কঞ্চির দু'দিক মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। পূজার ফুলের মালাকে বলা

হয় (খুমত্রুং) বা খুমতীরাং। এসব সামগ্রী দেবপূজার প্রতীক বা উপকরণ। ওয়াথপ এইচ আকারে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় - যা দেবাসনের প্রধান দেবপ্রতীক। প্রায় প্রতি পূজায় ওয়াথপ দেবতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যাকে লাম্প্রা ওয়াথপও বলা হয়। টিপরা সমাজের দেবপূজাকে মোটামুটি দু'ভাবে ভাগ করা যায়। টিপ্রাদের আদি পেশা জুম। জুমকে কেন্দ্র করে ফসল বৃদ্ধি ও ফসল রক্ষার জন্য পূজা হয়। রোগ নিরাময়ের জন্য অপদেবতার পূজা। বসন্তের সমাগমে যখন বিহঙ্গকুল কলরবমুখর, তখন বনে বনে বৃক্ষকুল কচি কিশলয়ে ও সুরভিত মুকুলে মুকুলিত তখনই ঐ বনজফুলে জুম কাটার উদ্দেশ্যে দেবদেবীর পূজার সূচনা। সুকুন্দ্রায় - মুকুন্দ্রায় দেবদ্বয় সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসাবে পূজিত। জুম করার উদ্দেশ্যে গভীর বন নতুন দা দিয়ে কাটতে হয়। তখন বড় বড় বৃক্ষাদি কাটার সময় হাত-পা কাটা যেতে পারে। কর্তিত বৃক্ষাদি গায়ের উপর এসে পড়তে পারে। ঐসব অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটার জন্য ওয়াথপ স্থাপন করে সুকুন্দ্রায়-মুকুন্দ্রায় দেবের পূজা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে দুই দেবতাকে দু'টি মোরগ বলি দেওয়া হয়। এই পূজা শেষ হলে সংসারে শান্তি কামনায় ওয়াথপ স্থাপন করে কাথারক নামে যুগ্ম দেবতার পূজা দেওয়া হয়। কাথারক পূজায়ও দুটি মোরগী বলি দেওয়া হয়ে থাকে। এর পর কালী পূজা। কালী পূজাতে চিনি, বাতাসা, আতপ চাল, কলা সহকারে পূজা বেদিতে নৈবেদ্য ভোজ্য নিবেদন করা হয় ও একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। এই কালী পূজার সঙ্গে নদীতে একটা পাঁঠা বলি দিয়ে তৌয়বুকমা পূজাও দেওয়া হয়। গ্রামবাসী সকলে মিলিত হয়ে এইসব পূজা করে এবং বলিবধ্য জীবের মাংস সকলে মিলিতভাবে রান্না করে খায়। গ্রামবাসীর আর এক পূজা কের পূজা। কের পূজাও জুম কাটার আগে করা হয়। এই পূজায় কালী, তৈবুকমা, মাইলুংমা, খুলুংমা, ইখিত্রা, বিখিত্রা, কালেয়া, কলেয়া, বুড়াছা, বণিরক থুবনাইরক, হাচুকমা, সাংগ্রংমা, প্রায় সব দেবদেবীই মিলিতভাবে পূজা পায়। মহামারী রোগ ব্যাধি না হওয়ার কামনায়, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী যাতে ফসল নষ্ট না করে এসব কামনায় কেরপূজা করা হয়। অচাই এসব পূজায় পৌরোহিত্য করেন ও প্রতি পূজায় দেবতার উদ্দেশ্যে কিছু মদ উৎসর্গ করে অবশিষ্ট মদ, মাংসের সঙ্গে গ্রামবাসীরা ভোগ করে। গ্রামে থাকে চৌধুরি ও কামিফাং। অচাই, বারোয়া, গ্রামবাসী সকলেই চৌধুরির বাড়িতে সমবেত হয়। চৌধুরি বাড়িতে পূজার পূর্বে চাঁদার ব্যাপারে আলোচনা সভা হয়। চাঁদা সংগ্রহ হলে পূজার প্রয়োজনীয় যাবতীয় উৎসর্গ করার সামগ্রী ও বলিবধ্য জীবসমূহ চৌধুরির বাড়িতে রাখা হয়। চৌধুরির নামে অচাই পূজা অনুষ্ঠান ও নৈবেদ্য দেবতাকে উৎসর্গ করে। চৌধুরি গ্রামবাসীর

প্রতিনিধি। পূজার শেষে সমস্ত উৎসর্গীকৃত সামগ্রী নিয়ে সকলে চৌধুরির বাড়িতে মিলিত হয়। সেখানে বলি দেওয়া পশুর মাংস রান্না করে ভোজন করে। সঙ্গে মদ্যপানও চলে। কামিফাং গ্রামের সর্দার তাকে বিশেষ উৎসর্গীকৃত প্রসাদ দিয়ে সম্মান করা হয়। মাঘ মাসে জুম কাটা শেষ হয়ে যায়। কাটা জুম পাহাড় পর্বত জুড়ে চৈত্র মাসে শুকোতে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তিতে গড়িয়া পূজার সূচনা। গড়িয়া পূজায় মোরগ, পাঁঠা ও ফলমূল উৎসর্গ করে দেওয়া হয় পশু বলি। চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্বদিনকে বলা হয় হারিবিষু। চৈত্রসংক্রান্তি গড়িয়ার প্রতিষ্ঠানের দিন। সেই দিনকে বলা হয় হারিবিষু। রিয়াং সম্প্রদায় হারিবিষুর দিন থেকে গড়িয়া উৎসবে মেতে ওঠে। গড়িয়া নৃত্যে আছে বাইশ তাল। ঢোল ও বাঁশি বাজিয়ে গড়িয়া নৃত্য চলে। গড়িয়া নাচকে খেরেবাই তাল বলে। নৃত্যকারী দলকে বলা হয় 'গড়েয়ানি সেংজারক'। এই নৃত্য চলে বৈশাখের সাত তারিখ পর্যন্ত। গড়িয়া প্রতীকসহ সাতদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে নৃত্য চলে। সাত দিন পর পূর্বস্থানে ফিরে এসে, দেব প্রতীক বেদিতে স্থাপন করে পূজার শেষে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়।

গড়িয়া দেবতার প্রতীক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও দফা ভেদে পার্থক্য দেখা যায়। পাঁচ হাত বা সাত হাত পরিমিত একটি বাঁশ নিয়ে এক প্রান্তের আড়াই হাত নীচে গাঁইটের কিছু উপরে ছিদ্র করে একটি শক্ত কঞ্চি বাঁশের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কঞ্চির উভয় প্রান্তে চুলের মতো উগুলি দড়ি দুই গোছা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। বাঁশের উপরিভাগে বসানো হয় গোলাকার কাঠের তৈরি মুখমণ্ডল। এরূপ প্রতীক আসলং, কেওয়া, আনক দফার মধ্যে ব্যবহার করা হয়। রিয়াং ও পুরান টিপ্রা, আসনে বাঁশের অগ্রভাগসহ মাটিতে পুঁতে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে। নৃত্যরত অবস্থায় একটি শূলে রিসা বেঁধে দেবপ্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে। জমাতিয়াগণ অষ্টধাতু ও স্বর্ণনির্মিত গড়িয়া মূর্তি ব্যবহার করে থাকেন। ত্রিপুরা রাজ্যের এমন কি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব উপজাতিগণের দেবতার প্রতীক বাঁশের তৈরি। বাঁশ দিয়ে ওয়াথপ দিগ, খং, থারুক, নাগ্রি, মারই, লাহান, কাইতেবে ইত্যাদি পূজার বেদির তৈরি করা হয় সাজ সরঞ্জাম। প্রত্যেক দেবতার পূজায় আসন সাজিয়ে সেসব প্রতীক উপাদানের দ্বারা সাজসজ্জা করা হয়। ফল, ধূপ, জল, খই, চালের পিঠা, শুকনা চাল বাটা পাউডার, হলদি, ফুল, আম্র পল্লব, কলা, চিনি, বাতাসা, চাল, ফুলের মালা, দূর্বা, তুলসীপাতা নৈবেদ্য উৎসর্গের কাজে ব্যবহৃত হয়। হিন্দু দেবদেবীর পূজার উপকরণগুলি সম্পূর্ণ উপজাতীয় উপকরণ থেকে গৃহীত হতে পারে। এ ছাড়া আসনে নতুন কাপড়, তেল, সিঁদুর, দূর্বা বেলপাতা ইত্যাদিও উপকরণ হিসেবে উৎসর্গ করা হয়। কোন কোন পূজায়

রান্নাভাত, তরকারি, শাকসব্‌জিও উৎসর্গীকৃত হয়। এইসব পূজা জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ কর্মেও করা হয়। অচাই বা পুরোহিত এইসব পূজা করে থাকে। এইসব পূজা রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে, অপদেবতা বিতাড়নে, ঐশ্বর্য বা সমৃদ্ধি কামনায়, শত্রু দমনের উদ্দেশ্যে, নব দম্পতির মঙ্গল কামনায়, শুভ যাত্রায় পূজিত হয়ে থাকে। ইহ্‌কালে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য এবং পরকালে আত্মায় শান্তির জন্য এইসব দেবদেবীর পূজা প্রচলিত। এসব বাঁশের তৈরি প্রতীকসমূহে 'ওয়াথপ্'-ই প্রধান প্রতীক। এইসব পূজার সাজসজ্জায় উপজাতিদের পুষ্পপ্রিয় মনোভাব, সৌন্দর্যপ্রিয় সুরুচি, সুগন্ধির দ্রব্যের আদর, ও শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। পূজায় ও সজ্জায় ফুলের ও সিঁদুরের ব্যবহার উপজাতিদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও রীতি। ঋগ্বেদের স্তোত্র, প্রার্থনামন্ত্র, বশীকরণ, চালান, বাণমারা ও কুশপুত্তলিকা দাহন ইত্যাদি নৈসর্গিকভাবে আপ্লুত মুণিঋষিদের মানসিকতা প্রসূত। উপজাতীয় অচাই দ্বারা অনুষ্ঠিত পূজা ও দেবদেবী আহ্বান বিদ্বেষণ বশীকরণ সম্মোহন বিদ্যাও ঋগ্বেদের একটি শাখা বিশেষ। এক অর্থে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী আদি হিন্দু ও হিন্দুদেরই একটি শাখা বিশেষ। উপজাতীয় জনগণ ধর্মান্তরিত হিন্দু নয়। কাউকে জোর করে বা প্রলোভিত করে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত ও ধর্মান্তরিত করা হয়নি। মহাদেব নিজেই পার্বত্য জাতি ও পর্বতের আদিবাসী। মহাদেবের পত্নী পার্বতী। উপজাতির মানসিক গুণ, সরলতা, সত্যবাদিতা — সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ এই প্রতিধ্বনির প্রতিফলন। কোন কোন পৌরাণিক গ্রন্থে মহাদেবকে কিরাত রূপে কল্পনা করা হয়, পার্বতী কিরাত রমণী। কালী ও দুর্গা পূজায় সিঁদুর অপরিহার্য উপাদান ও সিঁদুর যৌন ভোগের প্রতীক। যার কপালে সিঁদুর নেই সেই রমণী যৌন সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত। উপজাতি সমাজে সামাজিক স্তরে মদ্যপান প্রচলিত থাকাতে, বংশ পরম্পরায় মদ্যপানে আকৃষ্ট ও অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। অতিরিক্ত মদ্যপান সুচিন্তা ও গঠনমূলক পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধক স্বরূপ। নিরক্ষরতা, মহাজনদের শোষণ ও প্রশাসনিক মারপ্যাঁচ, কূটকৌশল ইত্যাদি উপজাতীয় সমাজ বিকাশে, উন্নততর সভ্যতায় উত্তরণে প্রতিবন্ধক। সর্বোপরি রুচি ও মনোবৃত্তি বা মানসিক গুণ পরিবর্তনের অভাবে এই সমাজ অনগ্রসর।

প্রতি পূজায় পূজার আসনে দেবতাকে মদ উৎসর্গ করার বিধি রয়েছে। উৎসবে, ভোজে, বিবাহে, অতিথি আপ্যায়নে প্রচুর মদ পান করা হয়। সমস্ত উপজাতির বিশ্বাস, দেবদেবী কল্পনা প্রায় এক। মঙ্গলকারী দেবতার চেয়ে অমঙ্গলকারী দেবদেবীর পূজা-অর্চনা, ভূত-প্রেত, বিতাড়নের আনুষ্ঠানিক পূজা ও মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহারই বেশি। অপদেবতার হাত থেকে রক্ষার জন্য যাদুমন্ত্র প্রয়োগই বেশি।

মন্ত্রতন্ত্র যাদুবিদ্যা

অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা

---

১. সুরিমুং (প্রার্থনা)

জয় জয় সুকুন্দ্রায় জগতনি বীসাই।
জয় মুকুন্দ্রায় ভবোনি য়াথ্রাই।।
মীতাই কাইচিব্রাই অঙখা যত বরক-নি,
য়ংসা কুগসা, তগমা তকসা হা-গ' তং নাই-নি।।
ক-গ' মাই রীনাই মীতাই আমা মাইলুং-মা
চাং-গ' রি রীনাই মীতাই আমা খুলুংমা।।
সাংগ্রংমা, মায়ুং করাই গাড়ীনি মীতাই।
হাচুকমা, হাচুক-গ' তংনাই বুড়াছা বীছাই।।
তুইবুক মা যতনি প্রাণ মীথাংগ' তুই-বাই।
খুলুম জামা - মীতাই রক-ন' খা-বাই খুকবাই।।

২. সাধারণ দেব পূজায় উচ্চারিত সংকল্প বাক্য ও স্তুতি

(ক) কক-বরকে 'কুবেংমা'

হাং-নাই, দং-নাই,
আঁহা হেই বাবুই (অমুক মীতাই) - রা-জা!
উত্তর-অ তংগয়-ব' দক্ষিণ অ তংগয় ব'
পূবে তংগয়-ব' পশ্চিম অ তংগয় ব'
হাসিকাম তংগয়-ব' হা ওয়ানজীয় তংগয়-ব'
ধ্যান অ, তংগয়-ব' দরবার-অ তংগয়-ব'
দরকার য়াককারয়, ধ্যান য়াক কারঅয়,
আচুক ফাইদি, বাচা ফাইদি
চা-মা, না-ফাইদি, নুংমা না ফাইদি, দকসাই।

অনুবাদ ঃ

দেবতা আহবান ঃ "হে অমুক দেব - রাজা, উত্তরে থাকুন, দক্ষিণে থাকুন,

পূর্বে থাকুন, পশ্চিমে থাকুন, ধ্যানে দরবারে যেখানেই থাকুন ঐ কাজ ফেলে পূজাতে এসে বিরাজমান হোন, পূজা গ্রহণ করুন।"

(খ) পাত ফেলা ঃ এক জোড়া কাঁঠাল পাতা হাতে নিয়ে নিম্ন বাক্যে দেব এসেছে কিনা পাতা ফেলে দেখা, দু'টি একই পিঠ হলে না বোধক, দুটি পাতা একটি এপিঠ অন্যটি অন্যপিঠ হলে হাঁ- বোধক।

পাতকার মা - আচুকখা হিনখাই, বাচা খা হিনখাই
খকগয় মাতংয়া, হুই অয় মাতংয়া
লাইমা মিদি - লাইসা মিদি।
বামন সালে পণ্ডিত সালে
পুঁথি নায় অ পাঞ্জা নায় অ

আং কমলা কমথা।
লাইমা নায়অ লাইসা নাইঅ
কাংসা বলব কাংসা মীথাল
দক সাই

ব্যাখা ঃ- তুমি এসে থাকলে (পাতা সংকেতে) বল। ব্রাম্মণে পণ্ডিতে পাঁজি পুথি দেখে বলতে পারে। আমরা কলমা-কমথা (অচাই বারুয়া) পাতজোড়া ফেলে জানতে চাই তুমি এসেছে কিনা!

(গ) লাইসা চায়া খাইঃ পাত ঠিক না হলে আবার বলা হয়

(ক) নাইমা মিতৈ, লাইসা মিতৈ
মুনুই মুনুই আচুক খা
ব-নছে সা-গ', ব-নছে সীংগ'।
কাংসা মীথাল, কাংসা বলব, দকসাই!

(ঘ) চায়া খাই ঃ পুনঃ মন্ত্র

(ক) লাই মা দোষী, লাইসা দোষী
লাইমা সীলাইখা, লাইসা সীলাইখা
গুরু বক তৈ, বগয় রীখা
কাংসা বলবদি, কাংসা মীথালদি
দক সাই। দুহাই ঈশ্বর।

(ঙ) পাতা চায়াখাই — পুনঃ মন্ত্র

আঁহা হাংনাই, দংনাই কুবুই
আচুক য়া খীলাই, বাচায়া খীলাই
গুরুনি হুকুম বাই, গুরনি খুক তৗয়বাই
গুরু বকতৈ বগয় রীখা, চংগয় - রীখা
দোহাই গুরুনি চা-মাসিং আনি
চা-য়া গুরুনি দোহাই গুরু
পাত কারদি

গ, ঘ, ঙ এর ব্যাখা ঃ পাত সমান পিঠে পড়েছে, দেব। তুমি খেলছ, হাসছ রসিকতা করছ। এখন সমস্ত তোমার জিজ্ঞাস্য বলা হয়েছে। হয়ত পাতার দোষে দোষযুক্ত, আমার ডালি সাজান ভাল হয় নি, বিধি-সঙ্গত হয় নি, কিন্তু সেটা আমার গুরুর হুকুমেই করা হয়েছে সব গুরুর দোহাই আমার দোষ নয়।

(চ) পাত চায়াখাই — ঠিক না হলে পুনঃ মন্ত্র পাঠ বচন।

বিছি, বিছি খালি খালি, ওয়ানসুগয়, তংনাই
ভাবেগয় তংনাই, বনছে সাগ' বনছে সাগ' বনছে হিনঅ
কাংসা মীথালদি, কাংসা বলবদি
দুহাই গুরুনি, গুরুনি দোহাই।

ব্যাখ্যাঃ - পাতজোড়া ফেলে বারে বারে ঠিক না হলে বলতে হয় তুমি তুষ্ট হও, প্রতি বছর তোমার সেবায় আমরা প্রস্তুত। তাতে সেই পূজা যেমন গড়িয়াদেব, প্রতি বছর পূজা করতে হবে। তাই দেব সংকেত। বলির রক্ত দেখে হৃৎপিণ্ড দেখে, মোরগের বহিরগ্র ভাগ, চেঙ্গা দেখে, নাড়িভুঁড়ির অবস্থা দেখে শুভাশুভ সংকেত অচাই ব্যাখাসহ বলে দেয় তা শুনতে এক বোতল মদ দিতে হয়। সংকেত বাক্যের নাম "সেমা"।

(ছ) বারে বারে পাত ফেলে ঠিক না হলে প্রথম থেকে শুরু করে সমস্ত স্তোত্র মুখস্থ বলে পাত ফেলার বিধি আছে। কিন্তু বারে বারে না হলে পূজা সামগ্রীতে দোষ ত্রুটি আছে বুঝতে হবে। রোগী দুরারোগ্য হতে পারে বলে ধরা হয়। অনেক সময় রোগী মারা যাবে বলে মনে করা হয়। পাতা দোষযুক্ত জ্ঞানে পাতা বদলাতে হয়।

(জ) হামরা খিবি মুং- খোওয়া, দশা অশুভ বিসর্জন (কুবেংমা) স্তোত্র।

(ক) নীছা ফলনা (মুং) নাম (অমুক)
য়াক নি দা ফাল অই, চাংনি রি ফাই অই।
চামা রিখা, নুংমা রীখা, অসুক হিনখালাই
বিনি, হাময়া তংমানি, চায়া তংমানি, কুলুম তংমানি
কীসা তংমানি, সিলি তংমানি, বিলি তংমানি,
মীকলে তংমানি, কুংলে তংমানি, দশা তংমানি
মাপা তংমানি, খোয়া তংমানি, খুশি তংমানি,
ছিলি য়াক কারঅয়, বিলি যাক কারঅয়
হাময়া তংমানি চায়া তংমানি।
হা নি বুসুব-অ, তীয়নি কানাঅ
সুগয় - তীলাংদি, রকগয় - তীলাংদি বল্লাই।

ব্যাখ্যা - তোমার পুত্র (অমুক) পরিধেয় (কোমরের বস্ত্র) বেচে হাতের একমাত্র দা বিক্রি করে তোমার পূজার অর্ঘ্য সংগ্রহ করেছে, অর্ঘ্য নিবেদন করেছে কাজেই সমস্ত দায় মুক্ত কর — অমঙ্গল ধৌত করে নিয়ে যাও।

(খ) কবকমা (পরিবেশন) মন্ত্র ঃ স্তোত্র - তুমি এসে ডালিতে বসেছে। পদ প্রক্ষালন কর, তা হলে, অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে তা তোমার সোনার থালা রূপার বাটিতে দিয়েছি, ভোগ কর (জল উৎসর্গ করবে)।

লাহানবাই তৈ চেরদি।

আঁহা - যাকসুদি, খুক সুদি,
আঁহা কুবুই আসুক হিন খীলাই
রাংচাকনি বাতি, রুফাই নি খুরি
য়াচাক গয় চাংদি, খুক চাক গয় চাদি
(লাহান বাই তৈচেরদি)
নরকনি অকপুংতৈ খাপুংতৈ, বিনি আয়ুক পুংগয়
থালুক পুংগয়, নুথুং পুংগয় হামঅয় তংথুন
চাঅয় তংথুন।

ব্যাখ্যা ঃ তোমাদের যেমন উদয় পূর্ণ হয়েছে সেইরূপ জাতকের সর্ব পূর্ণ হোক।

নুথুং বাড়েথুন, মাই-রাং বাড়েথুন,
রাংখক বাড়েথুন রিতীং বাড়ে থুন,
বনছে সাগ, বনছে কুঅ, দকসাই।

(সংসার বাড়ুক, ঐশ্বর্য শ্রী বৃদ্ধি হোক, তাই তোমাকে বলা হচ্ছে।)

(গ) মদ্য উৎসর্গ ঃ য়াক সুদি, খুক সুদি, চামা নাদি, নুংমা নাদি

চেবা কীথার বাই চুক্তি কীথার বাই

আওয়ান বাই খামচুই বাই বকগয় রীখা

চেংগয় রীখা।

ব্যাখ্যা ঃ হাত মুখ ধৌত করুন, আহার গ্রহণ করুন, পবিত্র মদসহ, পবিত্র পিষ্টক খই সহ, অর্পণ করা হয়েছে।

(ঘ) বলি (তানমুং) বধ্য জীবনের প্রতি মন্ত্র উচ্চারণ। সম্বোধন। বলির বধ্য জীবকে নিম্নবাক্যে সম্বোধন করবেন।

(১) পুন নঃ হিনদি (ছাগকে সম্বোধন করবে) শ্রীবাগবল, রাজা
(২) তক নঃ হিনদি (মোরগকে ঐ) শ্রীঅনুপক্ষী রাজা
(৩) ওয়াক নঃ হিনদি (শূকরকে ঐ) শ্রীবরাহ রাজা
(৪) ফারুক নঃ হিনদি (কবুতরকে ঔ) শ্রীউড়ো পক্ষী রাজা
(৫) মিছিপ নঃ হিনদি (মহিষকে ঔ) শ্রীক্রংমালী রাজা
৬) তাখুমনঃ হিনদি (হাঁসকে ঐ) শ্রীহংস বালেশ্বর রাজা
পাপ সুরকমানি কক (পাপ দায়মুক্ত বচন)
শ্রীবাগবল রাজা। হর' আচাইঅ, হর' রাজাক গ,
সাল' আচাইঅ, সালঅ তানজাক - গ,
অংকমলা কমথা গুরুনি খুকতৈ বাই, সা-গ,
সুব্রাই চংঅয়ছে, বারোয়া বকগীয়ছে
নীমা চংঅয়ছে নীফা চংঅয়ছে
রানাই পাপকীরীই , অচাই পাপকীরীই
নিনি পাপন' নীং খিতুং খাগয় তীলাংদি - বল্লাই।

ব্যাখ্যা ঃ হে বাগবল, রাজা, রাত্রে দিনে যখনই জন্ম হোক তোমাদের আমি কমলা কথা বলছি, সুব্রাই রাজার বিধান - তোমার মাতা পিতা স্বীকার করেছে বধে, অচাই বারোয়ারা পাপে দায়ী নয়, তোমাদের পাপ তোমাদের পুচ্ছাগ্রে বেঁধে নিয়ে যাও। বালাই (অশুভ) নিয়ে যাও।

"ওয়াথাইমা চক্রপয়া, খুঞুমা বু-য়া, ক্রংমা বুয়া
বুথুই হামদি বখল হামদি।"

ব্যাখ্যা ঃ দাঁতে দাঁত খিচতে পারবে না, কান নাড়তে পারবে না। বলির রক্ত, অঙ্গ সকল শুভ লক্ষণযুক্ত হোক

দেবপ্রতিঃ রাংচাক বাতি, রুফাই বাতি
য়াচাকগয় চাদি, ফন্‌সা ক্লাই ব'
আতু পুংনাই থবছা ক্লাই-ব বাতি পুংনাই
অক পুংঅয় চাদি, খুক পুং অয় চাদি।

অনুবাদ ঃ

সোনার পাত্র ভরে পান ভোজন কর, একখণ্ড এক বিন্দুই যথেষ্ট।

(ঙ) বিদায় ঃ বচন,
আহা চামা মানখা, নুংমা মানখা
অকপুংখা খা পুংখা, সুক্লাই লাংদি
রক খলাই লাংদি, অর' তাতাংদি, অর' তাচাদি
গিরি নুথুংনি বাহামজুক, তৈ খক না ফায়া - ন'
বল নানা, ফায়া-ন' রিনাই বারি রিসা বারি
নাংন, নরক নি দেশঅ নরক থাংদি, দকসাই।

ব্যাখ্যা ঃ আহা পান ভোজন পেয়েছো, উদর ভরে খেয়েছো, এখানে আর থেকো না, তোমরা অশুচি হবে, নিজ দেশে ফিরে যাও।

৩. তৌইবুক লবমানি (নদী বন্দনা)

নদীতে নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বন্দনা করে পাঁঠা মহিষ বলি দেওয়া হয়, তখন পূর্বোক্ত কুবেংমার মত তবে সুর পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়। রিয়াংদের এই মন্ত্র উচ্চারণ সুর আরও সুশ্রাব্য।

নদীবন্দনা

আঁহা ব্রাই, আঁহা ব্রাই আঁহা ব্রাই
শ্রী মা গংগি, আমা তৌই বুকমা
হাসিকাম কবংগয় হা উন-জৗই কাথন অয়
কেবেং ফুলেলে
কসং লকলেলে
দরবারঅ তং অয়-ব'
দরবার য়াক কারঅয়

ধ্যান অ তংঅয়ব
ধ্যান য়াক কারঅয়
আচুক ফাইজাদি
বাচা ফাইজাদি
নীছা ফলনা-
য়াকনি দা ফালয়ই
চাং নি রি ফালঅয়
চামা রিজাঅ
নুংমা রিজা অ
তীমানি বাগাই
বুমুং খুর পাই-লে
বীছা খুর পাইলে
চামা মান খীলাই
নুংমা মান খীলাই
ছিলি য়াক কারদি
রাংনি আয়ুক ন'
বকছাই ক্লাং দি
দকসাই!

ভাবার্থ ঃ মা নদী তুমি কুকি রাজ্যে শিয়র দিয়ে বঙ্গরাজ্যে পা রেখে দৈর্ঘ্যে দীর্ঘতম প্রস্থে সাদা প্রশস্ত হয়ে শুয়ে আছ। তুমি এসে বস। যেখানেই থাক দরবার ধ্যান ছেড়ে এসে বস। তোমার সন্তানের নাম স্মরণ কর কেন? তাই আজ সর্বস্ব দিয়ে তোমায় পূজা করছি আশীর্বাদ দিয়ে তার আয়ু সুরক্ষা কর।

ত্রিপুরীদের নৃত্য

সুরেন দেববর্মন

লেবাংবুমানি নৃত্য

ত্রিপুরী সমাজে পরিবেশিত অন্যতম জনপ্রিয় নৃত্য। এই নৃত্যের মূল উৎস জুমখেত। ধান গাছে যখন ধানের শিষ নির্গত হয় তখন অপরিপক্ক বীজধানের নরম অংশটি লেবাং নামে কীটের (বাঙলায় পঙ্গপাল জাতীয়) অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। অজস্র লেবাং পোকার আক্রমণে জুম ফসল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেমনটি বঙ্গীয় কৃষককুলের হয়ে থাকে পঙ্গপালের আক্রমণে। এই নৃত্যের উৎস লেবাং বিতাড়নের তাগিদ থেকে ধরে নিলেও, একে প্রমোদ নৃত্যের শ্রেণিভুক্ত করা যায়। সুতরাং লেবাং বুমানি নৃত্যের পরিকল্পনার নেপথ্যে আমোদ-প্রমোদ ও জীবিকার প্রয়োজনের তাগিদ — এই দুই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

লেবাং যখন জুমখেতে দলবদ্ধভাবে নেমে আসে তখন এদের তাড়াবার জন্য যে কৌশল বা পদ্ধতি ত্রিপুরী নরনারীরা গ্রহণ করে থাকে এবং পোকা তাড়াবার সময় যেভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন করতে হয় — কিভাবে ছন্দ বজায় রেখে দৌড়তে হয় — সামনে পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে ছুটোছুটি করতে হয়, এসবের ছন্দোবদ্ধ মুদ্রাসমষ্টির বহিরঙ্গ-রূপই লেবাং বুমানি নৃত্য। লেবাং কীটকে মেরে তাড়াবার জন্য দলবদ্ধ নৃত্যই হচ্ছে লেবাং বুমানি নৃত্য (A dance for beating or driving away the insect called Lebang)। 'বুমানি' কক্‌বরক শব্দ, যার অর্থ তাড়ানো। ভাষান্তরে, লেবাং তাড়াবার নৃত্য। একে লেবাং ধরবার নৃত্যও বলা যায়। কেননা যারা লেবাং বিতাড়নের জন্য নৃত্য পরিবেশন করে, তারা শুধু লেবাং তাড়িয়েই ক্ষান্ত থাকে না, ফাঁকে ফাঁকে লেবাং (কক্‌বরক ভাষায় কুক্) কীটগুলি হাতের মুঠোয় আটকে রেখে নাচিয়েরা মজা করে। লেবাং নৃত্য পরিবেশিত হয় এক টুকরো আস্ত বাঁশের তৈরি শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্রের তালে তালে। লেবাং নৃত্যকারীরা দু'হাতে দুটো টুকরো বাঁশ নিয়ে নৃত্যের তালে তালে ঐক্যবাদন সৃষ্টি করতে থাকে। তালবদ্ধ জোর শব্দের আকর্ষণ লেবাং ঝাঁকে ঝাঁকে জুমখেতে নামতে থাকে। এবং তখন নৃত্যকারীদের জুমখেতের উঁচুনিচু অংশে লেবাং ধরার বা মারার ভঙ্গি করতে হয়, সেই অনুকৃত মুদ্রাই লেবাং বুমানি নৃত্য।

লেবাং বুমানি নৃত্যের পরিবেশনার ক্ষেত্র মূলত জুমখেত। কিন্তু জুমচাষ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকায় জুমিয়াদের জীবিকার ক্ষেত্রও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। তাই লেবাং বুমানি নৃত্য আজকাল জুমখেতের পরিবর্তে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রমোদ নৃত্যরূপে পরিবেশিত হচ্ছে। তাই লেবাং বুমানি নৃত্যকে এখন প্রমোদ-নৃত্য বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, পত্র-পত্রিকায় বা তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন বিভাগের প্রচার পত্রিকায় লেবাং বুমানি নৃত্যের সময় ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। বলা হয়েছে, লেবাং নৃত্য বৈশাখ মাসে জুমখেতে ধানবীজ পোঁতার সময় পরিবেশিত হয়। এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে আশ্বিন-কার্তিক মাসে জুম-ধানে যখন শিষ নির্গত হয় তখনই লেবাং কীট জুমখেতে নেমে আসে।

গড়িয়া নৃত্য

মানব-সমাজে আচরিত সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গনৃত্য। নৃত্যের অনুষঙ্গ সঙ্গীত। সঙ্গীত নৃত্যের প্রাণস্পন্দন। আর মানব-সমাজ নৃত্য ও সঙ্গীত ব্যতিরেকে প্রাণহীন দেহ।

আবার জীবন ও জীবিকাকে কেন্দ্র করে আচার-অনুষ্ঠান পূজা-পার্বণ ধর্মীয় আচরণ সমাজ-মানসে অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে কোন আদিকাল থেকে। গড়িয়া নৃত্যও এমনি একটি জীবন ও জীবিকা-কেন্দ্রিক নত্য। গড়িয়া নৃত্য ত্রিপুরার জনপ্রিয় লৌকিক (Popular folk dance) নৃত্য। ত্রিপুবার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী (উপজাতীয়) গড়িয়া নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করেই গড়িয়া নৃত্যের উদ্ভব। ত্রিপুরার গড়িয়া পূজার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জুমখেতকে শস্যপূর্ণ করে তোলার জন্য গড়িয়া শস্যদেবতাকে আরাধনা। ত্রিপুরী ও অন্যান্য সমাজে গড়িয়া দেবতাকে সম্পদ ও সমৃদ্ধির (God of wealth and prosperity) দেবতা রূপে কল্পনা করা হয়।

কৃষিভিত্তিক বঙ্গীয় সমাজে আচরিত উৎসব-অনুষ্ঠানের দিকে তাকালে আমাদের চোখে যা প্রতিভাত হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে গাজন, ব্রত ও বিবিধ আচার নৃত্য। ঐসব উৎসব-অনুষ্ঠান জীবন ও জীবিকাভিত্তিক — ধর্মীয় আচার-আচরণও এসে মিশেছে এই সমস্ত নৃত্য-সংস্কারে।

ত্রিপুরার সার্বজনীন লোকনৃত্য গড়িয়া নৃত্যের অনুষঙ্গ হিসেবে পাশাপাশি রয়েছে লেবাং বুমানি ও মশক নৃত্য প্রভৃতি। গাজন নৃত্যে যেমন একদিকে ধর্মীয়

সংস্কার অনুসৃত অপরদিকে তেমনি রয়েছে লৌকিক সংস্কার ও ক্রিয়াকলাপ। গড়িয়া নৃত্যের মধ্যেও সেই একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করেই গড়িয়া নৃত্যের উদ্ভব। সেজন্যে গড়িয়া নৃত্যে দেবভক্তির ভাবনা-রসের সঙ্গে অনুষ্ঠানগত চিত্তবিনোদনের আনন্দরসের মিশ্রণ ঘটেছে। গড়িয়া পূজাকে সামাজিক উৎসবের সংজ্ঞা দেওয়া যায় এজন্যে যে গড়িয়া উৎসব বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণের পালা চলে প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী। ত্রিপুরী, জমাতিয়া ও রিয়াং প্রভৃতি কক্‌বরকভাষী সম্প্রদায় গড়িয়া পূজা উৎসব পালন করে থাকে — তাদের একান্ত বিশ্বাস, গড়িয়া দেবতাকে তুষ্ট করলে জুমকৃষির ফসল ভালো ফলবে। পরিবারের, সমাজের মঙ্গল হবে। তাই গড়িয়া উৎসব একদিকে যেমন সামাজিক, অপরদিকে ধর্মীয় বা পূজা পার্বণের। তাই গড়িয়া নৃত্যে ধর্মীয় আচারগত মিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু গড়িয়া নৃত্যের বিভিন্ন মুদ্রার ভঙ্গি প্রত্যক্ষ করলে ধর্ম ও আচার নিরপেক্ষ শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রমোদনৃত্য বলে প্রতীয়মান হবে। বলা বাহুল্য। গড়িয়া নৃত্যের অনুকৃত মুদ্রা বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রাকৃতিক ঘটনা ও পশুপাখির নানা অঙ্গভঙ্গিকে অনুকরণ করে গড়িয়া নৃত্যের মুদ্রার সৃষ্টি। শোনা যায়, প্রাচীনকালে গড়িয়া নৃত্যের মুদ্রার সংখ্যা ছিল ২২টি। এক-একটি মুদ্রা বা ঢংয়ের জন্য এক-একটি বোল। ঢোল (ত্রিপুরী ভাষায় 'খাম') বাজিয়ে বা বোল বাজিয়ে নৃত্যের ঢং বলে দেওয়া হয়। বোলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাচের ভঙ্গিও যায় পাল্টে। যেমন ঢোলে যখন ঘেঘেনে খেচাং চাং চাং চাং বোল অনুযায়ী নৃত্য শুরু হল — সেই নৃত্য ভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে গেল যখন ঢোলে বোল বেজে উঠল ঘেঘেন চাং ঘেঘেন চাং চাং চাং ঘেঘেন চাং। প্রত্যেক ঢংয়ের অর্থ রয়েছে। কোনোটা স্নানের, কোনটা কাপড় কাচার, আয়না দেখে কেশ-বিন্যাস, কোনোটা বাচ্চাটাকে খাওয়ানো হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকালে ২২টি ঢংয়ের গড়িয়া নৃত্যের মধ্যে বর্তমানে পাঁচ-ছয়টির বেশি প্রচলিত নেই। গড়িয়া নৃত্যে ঐন্দ্রজালিক (magical) অথবা রহস্যময়তার (mysticism) ভাব নেই। শুধু নৃত্যধারাকে বৈচিত্র্যময় এবং রমণীয় করার জন্য পশুপাখির বিচিত্র চলন-ভঙ্গিমার অনুকরণ করে নাচের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তোলা হয়।

তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সূচনা হিসেবে যে নৃত্য পরিবেশিত হয়, তা ধর্মীয় আচার নৃত্য বা লাস মুদ্রা। লাস মুদ্রা হচ্ছে দেবতার উদ্দেশ্যে বন্দনা বা স্তুতি জানাবার নৃত্যভঙ্গিমা। বঙ্গীয় সমাজের সর্বজনীন পূজামণ্ডপে পরিবেশিত আরতি নৃত্যের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। লাস নৃত্যের যে বোল (ঢাকের) বাজানো হয় তা নিম্নরূপ ঃ

গান্ কি ঘাঘান ঘিচন্ গান
চন গান্ গান্ ঘিচন্ ঘিচন্
ঘিচন চুগান্ ঘিচন্ গান্
চন্ গান্ গান্ ঘিচন্ ঘিচন্

গড়িয়া দেবতাকে বন্দনা করার পর যে সমস্ত নৃত্য ভঙ্গিমা বা মুদ্রা পরিবেশিত হয়ে থাকে, এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

(১) তক্মা মই ক্রাকমানি অর্থাৎ মুরগি কিভাবে খাবার কুড়িয়ে খায় তার অনুকরণে নৃত্য-ভঙ্গিমার পরিবেশন। এই নাচের বোল হচ্ছে ঃ

গানি গানি ঘান্ চন্ চন্
চগান্ গাগান্ চন্ চন্

(২) তক্মা খিতুং জাংরিমানি অর্থাৎ মুরগি-পুচ্ছ সঞ্চালন ভঙ্গিমা। প্রাকৃতিক কারণে মুরগি যেভাবে লেজ নাড়াচাড়া করে থাকে সে ভঙ্গিকে ঢাকে বোল বাজিয়ে নাচের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এ নাচের বোল এইরূপ ঃ

গানি গানি গান্ গানি চন্ চন্
ঘিগির্ ঘিচন্ ঘিচন্ চন্
(ঘাঘান্ চুগান্ চুগান্ ঘান্)

(৩) হারুংমাই কিছিলমানি — অর্থাৎ সমতলে জুমখেতের বায়ুতাড়িত নুইয়ে পড়া ধান গাছের ভঙ্গিমা। জুমখেতের ধান গাছ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে বাতাসের ঝাপটায় এদিক-সেদিক আন্দোলিত হয়ে নুইয়ে পড়তে থাকে। তারই অনুকরণ করে গড়িয়া নৃত্যের অন্যতম ভঙ্গিমায় রূপ দেওয়া হয়েছে — এই নাচের বোল নিম্নরূপ ঃ

গিগির্ গির্ গিগির্ গির্
গিগির্ ঘিচন্ ঘিচন্ চন্
গাগানে ঘান্ গাগনে ঘান্
গাগনে ঘিচন্ চন্

(৪) তক্মা ইয়াচিং মালমানি অর্থাৎ মুরগি হাঁটার সময় পায়ের আঙুলগুলি কিভাবে সঞ্চালিত হয় তারই ভঙ্গিমা। এই নৃত্যের বোল নিম্নরূপ ঃ

চন্‌কে ঘাঘান্ ঘাঘান্ ঘাঘান্
গানি চন্ চন্ চন্‌কি চুগান
চনি গানি গান্ চুগান্ ঘান্

(৫) মায়ুং ছুন্টা চানাইমানি অর্থাৎ হাতি কিভাবে খাবার খায় তার ভঙ্গিমা। হাতির খাওয়ার অনুকরণ নৃত্য-ভঙ্গিমায় ঢাকের বোল নিম্নরূপ ঃ

গানি চনে গান্ ঘিচন্ ঘিচন্ ঘিচন্
গাগান্ ঘান্ গানি চন্ চন্
চুগান্ ঘিচন্ গাগানে গান্
গানি চনি গান্ ঘিচন্।

উপরি-উক্ত গড়িয়া নৃত্যের মুদ্রাসমূহ প্রাচীনকালের বিস্তৃত নৃত্য-রীতির সংক্ষিপ্ত রূপ। জনশ্রুতি অনুযায়ী গড়িয়া দেবতা মূলত রণ বা যুদ্ধের দেবতা। তাই গড়িয়া নৃত্যের মধ্যে যুদ্ধ-নৃত্যের নিদর্শনও বর্তমান। কিন্তু গড়িয়া নৃত্যে সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আত্মনিবেদন প্রাধান্য লাভ করায় যুদ্ধ বা বীররসের নৃত্যের তাল ও লয় গৌণ আকার লাভ করেছে। গড়িয়া নৃত্যকে জাতীয় পর্যায়ে বা মানে উন্নীত করা একান্ত প্রয়োজন। তার জন্য ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলন, উন্নত পোষক ও উন্নততর মুদ্রা বা ভঙ্গির সংযোজন করার প্রয়াস চালানো দরকার। তার জন্যে ভারতীয় ক্লাসিক নৃত্যবিদদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা একান্ত সমীচীন হবে। গড়িয়া নৃত্য ত্রিপুরার সর্বজনীন নৃত্যধারা। তাই চর্চা ও সমীক্ষার আলোকে এগিয়ে যেতে হবে। এ রাজ্যের সংস্কৃতিমনা জনগণের প্রয়াস একান্ত কাম্য।

মশক নৃত্য (ত্রিপুরী)

'মশক' শব্দটি ত্রিপুরী বা কক্‌বরক শব্দ, যার অর্থ হরিণ। আক্ষরিক অর্থ হরিণ নৃত্য হলেও, প্রকৃত অর্থ হরিণ শিকার নৃত্য। পাঠকদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, হরিণ শিকারের সময় কি নৃত্য পরিবেশন করা হয়? আসলে তা নয়। শিকারীদল শিকার নিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফেরে। অনেক দূর-দূরান্তে গিয়ে তাদের শিকার করতে হয়। শিকার নিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে করতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে — ক্লান্তিকর একঘেয়ে পথচলাকে রমণীয় করার জন্য চিত্তবিনোদনেরও প্রয়োজন হয়। তাই শিকার বহনকারীদের চলার পথকে রমণীয় করার উদ্দেশ্যে সঙ্গী-সাথীরা গানের সঙ্গে নাচের ভঙ্গিতে পা ফেলে হাঁটতে শুরু

করে। নৃত্যের তালে তালে পথচলার ভঙ্গিকেই মশক নৃত্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। আজকাল অবশ্য হরিণ শিকারও নেই সুতরাং হরিণ নিয়ে নেচে নেচে বাড়ি ফেরার দৃশ্যও চোখে পড়বে না — তবু শিকারের নাচের ভঙ্গিটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, নাচের আসরে হরিণ শিকারের স্মৃতি হিসাবে মশক নৃত্য প্রচলিত হয়ে আছে।

মাইমিতা নৃত্য (ত্রিপুরী)

বাঙলার নবান্ন উৎসবের মতো ত্রিপুরী সমাজেও নবান্ন-উৎসব পালনের প্রচলন আছে। জুম-ধানের পাকা ফসল তোলার অব্যবহিত পরেই নবান্ন উৎসবের সাড়া পড়ে যায় ত্রিপুরীদের ঘরে ঘরে। নবান্ন উৎসবকে প্রাণবন্ত করার উদ্দেশ্যেই নৃত্য পরিবেশের রীতি প্রচলিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে মাইমিতা বলতে নতুন ধান বোঝায়। হিন্দু বাঙালি সমাজে পালিত নবান্ন উৎসব ও মাইমিতা উৎসব এক ও অভিন্ন। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের শেষে জুম-ধানের ফসল তোলা হয়ে যায় এবং জুম খেতে নির্মিত অস্থায়ী শস্য ভাণ্ডারে ফসল রাখা হয়। ফসল তোলার সঙ্গে সঙ্গে নবান্ন উৎসব পালিত হয় না —- শুভ দিনক্ষণ দেখে মাইমিতা উৎসব পালন করা হয়। মাইমিতা উৎসবের সময় শস্য-আধারের বেদিতে মুরগি বলি দেওয়ার প্রথা আছে। রন্ধক (শসা-আধার) পূজার পরে আত্মীয় পরিজন মিলে পান-ভোজন করা হয়। উৎসবকে প্রাণবন্ত ও আনন্দময় করে তোলার উদ্দেশ্যে নরনারী মিলে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। মাইমিতা উৎসব উপলক্ষে নৃত্যটি পরিবেশিত হয় বলে এই নৃত্যের নাম মাইমিতা।

খার্চি পূজা তথা চতুর্দশদেবতার পূজা (পৌরাণিক নেপথ্য কাহিনি)

ত্রিপুরা সুপ্রসিদ্ধ ও ঐতিহ্যমণ্ডিত খার্চি তথা চতুর্দশদেবতার পূজার নেপথ্য কাহিনি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক — যেহেতু এর কাহিনি আংশিক ইতিহাস মিশ্রিত এবং আংশিক প্রবাদরঞ্জিত। তামাম দুনিয়ার তীর্থক্ষেত্র ও দেবদেবীর মন্দির-দেউলের কাহিনি সমূহ দাঁড়িয়ে আছে আংশিক-বাস্তব আংশিক কল্প-কাহিনির বেদিমূলে। ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস-গ্রন্থাবলী রাজরত্নাকর ও রাজমালা এসবের সাক্ষ্য বহন করছে। কথিত আছে, পৌরাণিক যুগে ত্রিপুরার রাজা দৈত্যের পুত্র রাজা ত্রিপুর অত্যন্ত অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক ও বিধর্মী ছিলেন। পুত্রের অপকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মহারাজ দৈত্য ত্রিপুরের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থে গমন করেন।

মহারাজা ত্রিপুর রাজ্যভার প্রাপ্ত হয়েও তার পূর্বচরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হননি। বরং প্রজাদের ওপর তাঁর অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে শান্তিপ্রিয় প্রজাবর্গ অত্যাচারী রাজার কবল থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য দেবাদিদেব মহেশ্বরের কাছে আকুল প্রার্থনা নিবেদন করতে লাগল। প্রজাবর্গের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাদের দুর্গতির অবসান করার মানসে মহেশ্বর নিজের হাতে অত্যাচারী রাজা ত্রিপুরকে ত্রিশূলবিদ্ধ করে হত্যা করেন। এই প্রসঙ্গ রাজমালায় পাওয়া যায়।

"মারিলেক শল অস্ত্র হৃদয় উপর।
শিবমুখ হেরি রাজ্য ত্যজে কলেবর।।"

রাজমালা ; ত্রিপুর খণ্ড ১১ পৃঃ

মহাদেব কর্তৃক অত্যাচারী রাজা নিহত হবার পর রাজ্যবাসী প্রজারা অরাজকতার কবলে পতিত হয়। অতঃপর বিপন্ন প্রজাবর্গ মহাদেবের শরণাপন্ন হলে তাঁরই কৃপায় পুণ্যবান রাজা ত্রিলোচনের জন্ম হয়। কথিত আছে, মহাদেবের বরে ত্রিপুরের বিধবা পত্নী রানী হীরাবতী পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ করেন। রাজা ত্রিলোচন মহাদেবের বরদানে রানী হীরাবতীর গর্ভের সন্তান।

বলা বাহুল্য, রাজা ত্রিলোচন কিংবদন্তী যুগের (mythological age) রাজা বলে রাজ্যমালায় বর্ণিত হয়েছেন। রাজমালা প্রণেতাগণ রাজা ত্রিলোচনকে মহাভারতের রাজা যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক রাজা বলে বর্ণনা করেছেন।

রাজমালায় এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, মহাদেবের আদেশে রাজা ত্রিলোচন চতুর্দশ দেবতার বিগ্রহ স্থাপন করেন।

এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরার মহারাজারা মঙ্গোলজাতি গোষ্ঠীভুক্ত হলেও সুদূর অতীতকাল থেকে সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী এবং সনাতন হিন্দুধর্ম পালন করে এসেছেন — যার প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা সুকঠিন। চতুর্দশ দেবতাবর্গের মধ্যে সকলই হিন্দু দেবদেবী। যথা ঃ

হর, উমা, হরি, মা, বাণী, কুমার, গণপা, বিধি, ক্ষ্মা, অব্ধি, গঙ্গা, শিখি, কাম ও হিমাদ্রি।

এই চতুর্দশ দেবদেবী ত্রিপুরার মাণিক্য-বংশেব কুলদেবতা হিসাবে পূজিত। চতুর্দশ দেবদেবীর মুণ্ড-মূর্তি অর্চিত হয়। মুণ্ডসমূহ অষ্টধাতু নির্মিত। চতুর্দশ দেবতার প্রধান পুরোহিতের উপাধি চন্তাই। অন্য পূজারীবর্গ দেওড়াই নামে পরিচিত।

কামাখ্যাদেবীর পূজারীদের উপাধি দেওড়ি। দেওড়াই একার্থবাচক বলে অনুমান করা যায়। এই শব্দযুগল দেবল শব্দের অপভ্রংশ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

রাজমালা প্রণেতা মনে করেন চন্তাই ও দেওড়াইগণ সবাই বহিরাগত এবং সংসার ত্যাগী দণ্ডী ছিলেন। তবে পরবর্তীকালে ত্রিপুরায় দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে এবং তাঁদের উত্তরপুরুষদের সঙ্গে স্থানীয় সমাজের মানুষদের বিবাহাদি ও সামাজিক সংমিশ্রণের ফলে তাঁরা সংসারী হয়ে পড়েন — কিন্তু তাঁদের আচার-ব্যবহার ও পবিত্র জীবনযাপন প্রশ্নাতীত।

ত্রিপুরা রাজাদের শাসনকালে দেওড়াই উপাধিধারী পূজকগণ ছাড়াও গালিম বা ঘালিম প্রভৃতি কতিপয় সম্প্রদায়ের লোক পুরুষানুক্রমে দেবালয়ের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এরা সবাই রাজকীয় বৃত্তিভোগী কর্মচারী বা সেবাইত। এদের বংশধর ছাড়া অন্য কোনো বংশের লোক চতুর্দশদেবতার পূজারী হবার অধিকার নেই। তাদের বংশ থেকেই যোগ্যতা অনুসারে পূজারীবৃন্দ নিযুক্ত হয়ে থাকেন — এবং পূজারীবৃন্দ থেকেই যোগ্যতা ও সাধুতার গুণে ক্রমশ চন্তাইপদে নিযুক্ত হন।

চতুর্দশদেবতার পূজার বৈশিষ্ট্য

আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে খার্চি পূজার সূচনা হয়। এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য যে, খার্চি পূজা স্থানীয় ধর্মীয় উৎসব হলেও (যেহেতু এ জাতীয় পূজা অন্য কোথাও পালিত হয় না), এ পূজা হিন্দুদেবদেবীর পূজা — যদিও পূজা-পদ্ধতি ভিন্নতর। চতুর্দশ দেবদেবীর সকলেই আর্যগণের পূজিত দেবদেবী। দেবদেবীর বিগ্রহের পূজকগণও ত্রিপুরার পার্বত্য জাতি নয় বলে রাজমালার প্রণেতা বর্ণনা করে গেছেন। তবে ব্রহ্মণ্য ধর্মের আচরিত ও পূজিত চতুর্দশ দেবদেবীর পূজকদের (চন্তাই ও দেওড়াই) পূজাপ্রণালী ও মন্ত্রাদি পাঠ ভিন্নতর। চন্তাইগণ যে মন্ত্র পাঠ করেন তা দুর্বোধ্য। এইসব মন্ত্রের অর্থ যুগ যুগ ধরে গোপন করে রাখা হয়েছে — কথিত আছে, পূজাপ্রণালী ও মন্ত্রাদি বিষয়ে কোনো এক মহারাজ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হলে চন্তাই বলেছিলেন — "মহারাজ, পূজা-প্রণালী ও মন্ত্রাদি অত্যন্ত গোপনীয় এবং প্রকাশযোগ্য নয় — প্রকাশ করলে ইষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে।"

জগৎখ্যাত ভাষাবিদ ডঃ সুনীতিকুমার স্বয়ং এ বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেও চন্তাইদের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাননি। তবে চন্তাইগণ পূজা-অর্চনা বিষয়ে গোপনীয়তা রাখলেও দেবদেবীগণের মহিমা কীর্তনের বর্ণনা-পাঠে অনুধাবন করা যায় — খার্চি পূজা-মন্ত্রের সঙ্গে ধ্যানের সাযুজ্য রয়েছে।

কের পূজা

কের পূজা ত্রিপুরার অন্যতম প্রসিদ্ধ স্থানীয় পূজা। এ পূজা-অনুষ্ঠান মূলত রাজপরিবার কর্তৃক পালিত হলেও, রাজবাড়ির বাইরে মফস্বলবাসী ত্রিপুরী সমাজেও এ পূজা পালিত হয়ে থাকে। এ পূজার মূল উদ্দেশ্য জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা।

খার্চি পূজার সমাপ্তির চৌদ্দদিন পর শনি কিংবা মঙ্গলবারে কের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। খার্চি পূজার সঙ্গে কের পূজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়ে গেছে। খার্চি পূজার পুরোহিত চন্তাই কের পূজারও পুরোহিত। পূজা আরম্ভ হওয়ার আগে একটি এলাকা নির্ধারিত করা হয়। এই নির্ধারিত এলাকার ভেতরে পূজা চলাকালীন কারুর জন্ম ও মৃত্যু হলে পূজা পণ্ড হয়ে যায় এবং তা অমঙ্গলসূচক বলে ধরে নেওয়া হয়। এ জন্য পূজা আরম্ভের আগে খোঁজ-খবর নিয়ে আসন্নপ্রসসা রমণী ও মৃতপ্রায় রোগীদের সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পূজা-অর্চনাকালে মানুষ গৃহপালিত পশু ইতাদি সীমানার বাইরে যাওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ। পূজার সময় জামা-জুতো, খড়ম, পাগড়ি বা ছাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ। গীতবাদ্য, কোলাহল এমনকি জোরগলায় কথা বলাও নিষিদ্ধ। স্বয়ং মহারাজগণও এই নিয়ম পালন করতেন। পূজা অর্চনাকালে একদিন দু রাত নির্ধারিত সীমানার ভেতর লোকজনদের অবরুদ্ধ থাকতে হয়। বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজের সময় কিছু সময়ের জন্য লোকজনদের বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হত তোপধ্বনি ঘোষণার মাধ্যমে। পুনর্বার তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বাইরে অবস্থানরত সবাইকে ঘরে ফিরে আসতে হত। কের পূজা করলে রাজ্যের মঙ্গল ও দশের মঙ্গল হয় বলে লোক-বিশ্বাস বিরাজমান। কোনো কারণে পূজা ভেঙে গেলে বা বিঘ্নিত হলে পুনর্বার সপ্তাহের মধ্যে শনিবার অথবা মঙ্গলবারে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পূজা সম্পাদন করতে হয়। রাজধানীর কের পূজার পাট সম্পন্ন হবার পর পার্বত্য পল্লীতে পূর্বোক্ত নিয়মে কের পূজা পালিত হয়। তৎকালে বাইরের লোকজন পল্লীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কের পূজার প্রধান উদ্দেশ্য বছরে একবার সকলকে নবসৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। সারা বছরের সঞ্চিত পাপকার্যাদি ঝেড়ে ফেলে সকলকে পবিত্র করে নবজীবনের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সংসার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে একথাটি জানান দেবার জন্যই কের পূজার আয়োজন। ধর্মাচরণের সঙ্গে তাত্ত্বিক-উপদেশের এহেন আদর্শ প্রচার অন্যত্র বিরল। কের পূজা বর্তমানে আগের মতো জাঁকজমক সহকারে পালিত হয় না — শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য রাজবাড়ির চত্বরে কের পূজা

পালিত হয় — কের পূজা উপলক্ষে রাজ্য সরকারের সকল অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ বন্ধ থাকে।

সপ্তাহকালব্যাপী পূজা-অনুষ্ঠান
খার্চি শব্দের সম্ভাব্য অর্থ

খার্চি পূজা পালন করতে হয় অত্যন্ত পবিত্রতা ও শুচিতার সঙ্গে। এ পূজার একদিন আগে ভোরবেলায় হাওড়া নদীতে দেবদেবীর বিগ্রহকে স্নান করানো হয়।

খার্চি শব্দের প্রকৃত অর্থ এখনো জানা যায়নি। শব্দটি ত্রিপুরী ভাষা অর্থাৎ কক্‌বরক থেকে উদ্ভূত কিনা, নিশ্চিত করে বলা যায় না। খার্চি যদি কক্‌বরক্ শব্দজাত না হয় তাহলে ক্ষ্মা (পৃথিবী) এবং অর্চি (দীপ্তি বা শিখা) এই শব্দযুগল থেকে খার্চি শব্দের উৎপত্তি বলে অনুমান করা চলে। খার্চি শব্দ পৃথিবী ও দীপ্তি ও দুই-এর সমাহারে সৃষ্টি হয়ে চতুর্দশ দেবদেবীদের পৃথিবী ও দীপ্তির প্রতীক স্বরূপ একটি মাত্র শব্দ খার্চি রূপে অভিহিত হয়েছে — এরকম ব্যাখ্যা দিলে পাঠকবর্গের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও তাদের অনুসন্ধিৎসু মনকে চাঙ্গা করে তুলবে এ বিষয়ে লেখক সুনিশ্চিত।

সপ্তাহব্যাপী খার্চি পূজার সময় চতুর্দশ দেবতার মন্দির-সংলগ্ন পুরাতন রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে ধর্মীয় ও সামাজিক মেলা বসে। পূজার সাতদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত অগণিত ভক্তবৃন্দের সমাবেশ পূজার প্রাঙ্গণকে আনন্দমুখর ও ধর্মীয় বাতাবরণে পরিপূর্ণ করে তোলে। পুরাকালে মোষবলি ছাগবলি এমনকি মনুষ্য বলির প্রথা ছিল বলে শোনা যায়। বর্তমান শুধুমাত্র ছাগবলি, পায়রাবলি, মুরগিবলির প্রথা প্রচলিত আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র পূজার সাতদিন সকল দেবতার বিগ্রহ বাইরে এনে একটা প্রশস্ত জায়গায় স্থাপন করে পূজা করা হয়। সারা বছর মন্দিরের প্রকোষ্ঠে রাখা হয়।

একদা রাজা-পরিবারের কুল-দেবতা হিসাবে শুধুমাত্র রাজ-পরিবারে এই পূজা অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে চতুর্দশ দেবতা সর্বজনীন পূজা — এ পূজা শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় এ পূজা সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সংহতির প্রতীকরূপে ত্রিপুরার জনগণের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব রূপে সারাদেশে সমাদৃত।

জমাতিয়াদের ধর্ম ও পূজা পার্বণ

সুরেন দেববর্মন

সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব

জমাতিয়ারা আমোদপ্রিয়। দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়ে কাজ-কর্মের পাশাপাশি আর একটি আনন্দময় জীবনের পরিবেশ তৈরি করতে তারা সর্বদাই তৎপর থাকে। তারা নানাবিধ খেলা-ধূলা, হাসি-তামাসা এবং আন্দোৎসবে মেতে থাকতে ভালবাসে। নাচ-গান জমাতিয়াদের চিত্ত বিনোদনের বিশেষ উৎস। জমতিয়াদের বেশির ভাগ উৎসব ধর্ম সংক্রান্ত উৎসব। এই উৎসবগুলি সামাজিক এবং ফসল কাটা সংক্রান্ত উৎসব। হিন্দু বাঙালিদের উৎসবও তারা পালন করে থাকে। জমাতিয়ারা পান ভোজনাদির উৎসবের মাধ্যমে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করে থাকে। মোদ্দা কথা, জমাতিয়ারা পূজার মাধ্যমে চিত্তবিনোদনে বেশি করে মেতে ওঠে। শিশুর জন্ম ও শিশুর নামকরণকে কেন্দ্র করে জমাতিয়াদের আনন্দপূর্ণ উৎসবের মেজাজ ফুটে ওঠে। এই উৎসব ধর্মীয় উৎসবেরই একটি অঙ্গ বলে বিবেচিত। হিন্দু বাঙালিদের মতো জমাতিয়াদের শিশুর বয়স ছয় বা আট মাস পূর্ণ হলে অন্নপ্রাশন বা মুখে ভাত দেবার রীতি রয়েছে। এই উৎসবে আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধব সবাই আমন্ত্রিত হয়। জমাতিয়া যেহেতু হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তারা হিন্দুর দেবদেবীর পূজা-আরাধনা করে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজস্ব দেবদেবীর পূজাও করে থাকে। তারা অপদেবতার পূজাও করে থাকে। এই অপদেবতারা ক্ষতি সাধন করে বলে তাদের সন্তুষ্ট রাখতে হয়। খেত-খাবার যাতে শস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, তার জন্য ধান ও কার্পাসের দেবীকে পূজা করা হয়। লাম্প্রা পূজা জমাতিয়া সমাজের অন্যতম প্রধান পূজা। বিভিন্ন সময়ে এই পূজা পালিত হয়। সমাজের হিতসাধনই এই পূজার মূল উদ্দেশ্যে। জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু — জীবনের এই ত্রিবিধ লগ্নে লাম্প্রা পূজা দিতেই হয়। তাছাড়া জমাতিয়াদের সমাজে পূজিত অনেক দেবদেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। নকসু পূজা, বুড়াসাপূজা, বুরইরগ পূজা, মহাদেব পূজা, গড়িয়া পূজা, কের পূজা এবং খারচি পূজা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জমাতিয়া সমাজের সর্বজনীন পূজা বলতে গড়িয়া পূজাকে বোঝায়। গড়িয়া পূজা হিন্দু বাঙালিদের দুর্গাপূজার সমতুল বলা চলে। গড়িয়া দেবতা জমাতিয়াদের

মঙ্গলময় দেবতা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণের দেবতা। তাই সমাজের সকল স্তরের মানুষ এই পূজায় যোগদান করে।

জমাতিয়া ছাড়া ত্রিপুরী ও রিয়াংরাও গড়িয়া পূজা করে থাকে। গড়িয়া
প ূ জ া
চৈত্র-সংক্রান্তির আগের দিন থেকে শুরু হয় সাত দিন পালিত হয়। গৃহের প্রাঙ্গণে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সার্বজনীন গড়িয়া পূজার জন্য যে কয়েকজন পূজারী নিয়োগ করা হয় তারা হচ্ছে —

১। খেরকেং ২। অচাই ৩। মতাই বালনাই ৪। দোরিয়া ৫। বগলা ৬। ভাণ্ডারী। এই ছয়জন পূজারীদের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন।

১। গড়িয়া দেবের মুণ্ড এবং অন্যান্য পূজার সামগ্রী বহন করার দায়িত্ব বর্তায় খেরকেং-এর ওপর।

২। অচাই হচ্ছে পুরোহিত।

৩। গড়িয়া দেবের মূর্তি বহন করে মতাই বালনাই।

৪। মাদল বাদক হচ্ছে দোরাই।

৫। গড়িয়াদের সঙ্গী হিসেবে থাকতে হয় বগলাকে।

৬। জিনিসপত্র দেখাশুনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভাণ্ডারীর ওপর।

গড়িয়া পূজার পরেই কের পূজা জমাতিয়াদের প্রধান পূজা উৎসব। বিভিন্ন সংক্রামক রোগসমূহের হাত থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যেই কের পূজা করা হয়। কের পূজার বিশেষত্ব হল এই পূজা যেস্থানে অনুষ্ঠিত হয় সে স্থানটিকে নিষিদ্ধ এলাকা হিসেবে সীমারেখা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এই নিষিদ্ধ এলাকায় পূজাচলাকালীন কোনো মুমূর্ষু রোগীকে থাকতে দেওয়া হয় না। পূজার সময় নিষিদ্ধ এলাকা থেকে বাইরে যেতে এবং বাইরে থেকে ভিতরে প্রবেশ করা নিষেধ করা হয়। অচাই এবং সহযোগীরা কের পূজা করে থাকে। নিজস্ব পূজা-পার্বণ ছাড়াও জমাতিয়ারা হিন্দু বাঙালিদের দেবদেবী যথা দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা এবং শনিপূজা প্রভৃতি পূজা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দিয়ে সম্পাদন করে থাকে। পৌষ সংক্রান্তি, রথযাত্রা, দোলপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব পালনও তারা করে থাকে।

জগন্নাথদেবের প্রতিও জমাতিয়াদের প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস আছে। রথযাত্রার সময় তারা ফলফুল দিয়ে পূজা নিবেদন করে। রথযাত্রার শেষে জনসাধারণের কাছে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই সমস্ত উৎসব পালনের মাধ্যমে জমাতিয়াদের হিন্দু ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস প্রতীয়মান হয়। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, শিক্ষিত এবং আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত জমাতিয়ারা আদিম ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে ক্রমশ সরে এসে হিন্দু দেবদেবীর পূজারী হয়ে উঠেছে।

জমাতিয়াদের সমাজ-বৃত্তে পরিবর্তনের হাওয়ার নিশানা

বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে পৌঁছে কোনো উপজাতিই আজ সেই 'আদিম জাতি মার্কা' জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত নয়। ত্রিপুরার জমাতিয়ারাও বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, শিল্প বিপ্লব, সমাজ বিপ্লব, অর্থনৈতিক বিপ্লব এবং শিক্ষার আলোকের স্পর্শ পেয়ে ক্রমশ আধুনিক জীবনের নবধারায় পুষ্ট হয়ে উঠেছে। আজকের অগ্রসর জমাতিয়া সম্প্রদায় সমবায় ভিত্তিতে নিজেদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্ত করতে সচেষ্ট হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে স্কুল গড়ার কাজে সরকারের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। আদিম কৃষি পদ্ধতি 'জুম' চাষ-এর পরিবর্তে সমতলবাসীদের কৃষি-পদ্ধতির মাধ্যমে জীবনযাত্রাকে আধুনিকতার মানে উন্নীত করছে। গ্রামগঞ্জবাসী জমাতিয়াদের বালক-বালিকা যুবক-যুবতী স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে — জমাতিয়াদের মধ্যে এমনকি দুএকজন উচ্চপদে চাকুরিরত রয়েছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে নেই। বিগত যুক্তসরকারের জাঁদরেল যুবনেতা কৃষিমন্ত্রীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শুধু অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে নয়, সমাজনীতি ও ধর্মীয় ব্যাপারেও কিছু কিছু জমাতিয়া আধুনিক মনোভঙ্গির পরিচয় দিচ্ছে। জানা গেছে, তেলিয়ামুড়া সংলগ্ন একটি গ্রামের কতিপয় যুবক জনৈক কৃষ্ণমোহন জমাতিয়ার নেতৃত্বে 'লাম্প্রা-গড়িয়া-মিশন' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে সংস্কারমূলক আন্দোলনের মাধ্যম পুনরুজ্জীবন ঘটানো এই মিশনের লক্ষ্য। এদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো পূজা-পার্বণে পশু-পাখির বলি এবং মদ উৎসর্গ করা চলবে না। উপদেবতা-অপদেবতার পূজা করা চলবে না। এই সিদ্ধান্ত থেকে সহজে অনুমান করা যায় জমাতিয়া সমাজের নব্যযুবক সম্প্রদায় প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির ধ্বজা উড়িয়ে অতি আধুনিক মনের পরিচয় ঘোষণা করছে। এদের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে কোনো উন্নত সমাজের চাইতে এক ধাপ এগিয়ে।

রিয়াংদের দেব-দেবী ও নৃত্য

সুরেন দেববর্মন

রন্ধক পূজা

জুমের ধান কাটা শেষ হ'লে নবান্ন খাওয়ার আগে 'রন্ধক' পূজা দেওয়া হয়। সাধারণত কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন খাওয়া হয়। আবার বৈশাখে গড়িয়া পূজার সময় এবং আষাঢ় মাসেও এই দেবতার পূজা দেওয়া হয়। নবান্ন খাওয়ার আগে দুটি বড় ঘট বা পাতিল ভাল করে ধুয়ে মুছে পিটালি দিয়ে চিত্রিত করা হয়। আর হাতে কাটা জুমের সুতা দিয়ে মালা তৈরি করে রন্ধকের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। নতুন আতপ চাল দিয়ে ঘট দুটিকে পূর্ণ করে তাতে জুম থেকে কুড়ানো দু'একটি পাথর গুঁজে দেওয়া হয়। এই পাথরগুলিকে রিয়াংরা 'সৌভাগ্য-পাথর' বলে মনে করেন। কারণ এগুলি যার ঘরে যত বেশি থাকবে তার তত বেশি সৌভাগ্যোদয় হবে বলে তাঁদের বিশ্বাস।

মাইলুমা ও খুলুমা — দুটি ঘটের একটির নাম 'মাইলুমা' বা ধানের দেবী, অপরটির নাম 'খুলুমা' বা তুলার দেবী। 'খুলুমাতে' কিছু তুলাও দেওয়া হয়। দু'টুকরা কলাপাতাকে চিত্রিত করে তাতে দু'দেবীর ঘট স্থাপন করা হয়। ঘট স্থাপনের পর কলাপাতার যে অংশটুকু বাড়তি থাকে তাতে ফুল ইত্যাদি দিয়ে পূজা দেওয়া হয়।

বারুয়া — কলা, চিনি, বাতাসা ইত্যাদির নৈবেদ্যও থাকে পূজাতে। 'অচাই' পূজা দেওয়ার সময় একজন 'বারুয়া' বা সাহায্যকারীর সাহায্য নিয়ে থাকেন। অচাই ছাড়াও পূজা হতে পারে। তবে যারা বলি দেয় তাদের পক্ষে পূজায় 'অচাই' ডাকতেই হয়। ধূপ-দীপ এবং উলুধ্বনিও দেওয়া হয়। ঘটের সামনে কুলাতে সাজিয়ে দেওয়া হয় পান-সুপারি, ৭টি ডিম, ফুল ও চন্দন। বাড়ির উঠানে নিকানো জায়গায় মাটির বেদি করে তার ওপর পূজা হয়। ঘট বা পাতিলগুলির গায়ে সিঁদুর দিয়ে কালী মূর্তি আঁকা হয়। পূজার পরে ঘটগুলিকে বিসর্জন দেওয়া হয়। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে হাঁসও মোরগ বলি হয়ে থাকে। মোরগ কেটে তার অন্ত্র পরীক্ষার দ্বারা অচাই গৃহস্থের বৎসরের মঙ্গলামঙ্গল নিরূপণ করতে চেষ্টা করেন। মন্ত্র-তন্ত্র সব কিছু রিয়াং ভাষায় পাঠ করা হয়।

নকছু-মতাই — নবান্নের দিন 'নক্ছু'-মতাইও বা গৃহ-কোণের দেবীকে পূজা দেওয়া হয়। এই দেবী সম্বন্ধে রিয়াংদের ধারণা এই যে, ইনি সাপের দেবী। প্রথম ডম্বরু জলপ্রপাতে এর জন্ম হয় এবং সেখান থেকেই এই দেবীর পূজা শুরু হয়। এই দেবীর আরও ছয় বোন আছেন। রিয়াং সম্প্রদায়েই প্রথম এই পূজার প্রচলন। নবান্নের সময়ই এই পূজা হয়। দেবীর ভোগের জন্যে তিনটি নৈবেদ্য লাগে। তাতে খৈ ও অন্যান্য উপকরণ থাকে। মাংস দিয়েও তিনটি নৈবেদ্য দেওয়া হয়। অচাই এসে পূজা করে থাকেন। মুরগিও বলি হয়। বাঁশের তৈরি 'জাকরি' তৈরি করে ঘরের কোণে পেছনের দিকে চালের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। গোলাতে ধান পূর্ণ করার দিন গোলাতে এবং 'নকছু মতাই'-র সামনে পূজা দেওয়া হয়।

বেতিকপ্রু ও বাদিয়া — জুম থেকে সাধারণত দুবার ফসল কাটা হয়। প্রথমবারের ধান কাটাকে 'বেতি কাপ্রু' বলা হয় এবং দ্বিতীয় বারের ধান কাটাকে বলা হয় 'বাদিয়া'। 'বেতি কপ্রু' শেষ হলে 'বাদিয়া' করতে হয়। 'বেতি কপ্রুর শেষে দ্বিতীয় দফায় ধান কাটতে হলে বা 'বাদিয়া' করতে হলে পূজা দিতে হয়। অচাই জুমে পুজো দেন। একটি মোরগ, একটি 'রিছা' প্রভৃতি উপচার সহযোগে পূজা হয়। অচাই একটি বাঁশ চেঁচে ফুল তৈরি করেন এবং কিছু ধান রিছায় বেঁধে গোলাতে নিয়ে আসনে। অচাই-র কাঁধে থাকে ফুল তোলা বাঁশটি। হাতে তাকে একটি মাইছিঙ্গা বা যবের গাছ। অচাই গৃহস্থের বাড়ি উঠানে এসে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করেন — 'নগ্ চিতাইছা, বাহাই থে কানাই? নগফাং — কাফাইদি, কাফাইদি ; নগ্ ফ্লহা, ফ্লহা, কাফাইদি, কাফাইদি। ইয়াংছে খক্বা আবুক তংফাইদি। ফেবাই কংবা রুজু তংফাইদি।' অচাই — 'আমি কি করে এত ধান নিয়ে তোমার ঘরে ঢুকব? তোমার ঘর তো ছোট!' গৃহিণী — 'তোমার জন্যে আমি ঘর বড় করব। তুমি চিন্তা করোনা। ঘরে প্রবেশ কর।' তখন অচাই ঘরে প্রবেশ করে গোলাতে প্রথম ধানের আটি রাখেন।

মামিতা — যাঁদের মধ্যে রীতি আছে তাঁরা 'মামিতা' পূজাও দিয়ে থাকেন। জুমে উৎপন্ন বিন্নী চাল দিয়ে এই পূজা দিতে হয়। একে 'মাইকতাল' বা নবান্ন পূজা বলে।

কের পূজা — ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এই পূজা হয়। এই পূজা সাধারণত বাড়ী বন্ধ করার জন্যে দেওয়া হয়। এককভাবে বা বহুর মিলিত প্রচেষ্টায় দু'ভাবেই পূজা দেওয়া হয়। কের-এর পূর্বদিন মতাই কতর' বা কালী পূজা দেওয়া হয়। কের-এর দিন বাড়ির সীমানায় জন্মমৃত্যু হতে পারে না। তাই আসন্ন প্রসবা এবং

মুমূর্ষু ব্যক্তিদের কের-এর সীমা থেকে বের করে দেওয়া হয়। গান-বাজনা, আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা যথেষ্ট রয়েছে এই পূজাতে।

মতাইকতর, থুমনাইরগ, বলিরগ — কের পূজার দিন 'মতাই কতর' বা কালীপূজা, থুমনাইরগ ও বলিরগের পূজা ও বুড়াছার পূজা দিতে হয়।

নাকড়ি — বুড়াছার পূজায় দুটি মোরগ ও শূকর লাগে। সন্ধ্যার সময় গ্রামের দু'প্রান্তে 'নাকড়ি' পোঁতা হয় এবং তাতে ফুলের মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

ঘং — পূজার জন্যে আর এক খণ্ড বাঁশ পোঁতা হয়। তার নাম 'থারুক মা' কের-এর সময় যাতে কের-এর সীমায় কেউ না ঢুকতে পারে সেজন্যে পাড়ায় ঢুকবার পথে নিষেধ চিহ্ন বা 'ঘং' পুঁতে রাখা হয়। বাইরের মানুষ কেরের সীমায় ঢুকলেও পূজা নষ্ট হয়।

গঙ্গাপূজা — পৌষ মাসে 'গঙ্গা' পূজা দেওয়া হয়। যার যার রীতি অনুযায়ী পাঁঠা ও মহিষ বলি দেওয়া হয়। তবে গঙ্গা পূজা একজন বা কয়েকজন গ্রামবাসী মিলে দিয়ে থাকেন। আগে মহিষ বলি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। বর্তমানে কিন্তু তা আর দেওয়া হয় না। বর্তমানে ছাগল, মোরগ, হাঁস, কবুতর ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়।

গড়িয়া পূজা — গড়িয়া ও কালাইয়া দু'ভাই। রিয়াংরা গড়িয়া পূজা করেন। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে সাধারণত পূজা হয়। 'কেদা, বা একটুকরো বাঁশে ফুল তুলে তাতে সাদা-কালো সূতায় তৈরি করা একটি 'রিছা' বা বক্ষাবরণ মাথায় বাঁধা হয়। 'কেদা' না থাকলে 'কল' (কেদার চাইতে ছোট বাঁশের টুকরো) মাটিতে পুঁতে তাতে রিছা জড়ানো হয়। হাতে কাটা সূতার মালা তাতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সামনে থাকে একটি দা এবং ডিম। সামনে কলা পাতায় পূজা দেওয়া হয়। পূজাতে মোরগ ইত্যাদি বলি দেওয়ার রেওয়াজ আছে। যার যার মানতও দেওয়া হয় এই সময়। শূকর ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী বলি দেওয়া হয়। তবে মদ লাগে প্রচুর। বৈশাখের প্রথম দিকে সাত দিন এই দেবতার পূজা হয়। অচাই এসে পূজা দিয়ে যান। প্রতিদিন পূজার শেষে পূজাতে দেওয়া, দা, ডিম, ও কেদা কাঁধে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরে। কেদা বহনকারী দল বিভিন্ন ঢং এ গান গায়, নাচে এবং আমোদ-আহ্লাদ করে। এই সময় তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা-পয়সা ইত্যাদি সংগ্রহ করে। সাতদিন পরে সমবেত ভাবে সমাপ্তি পূজা হয়। তারপর কেদা বিসর্জন দেওয়া হয়। দেশের, দশের এবং পারিবারিক মঙ্গলের জন্যে সাধারণত এই পূজা দেওয়া হয়। গড়িয়া পূজার গানগুলির মধ্যে এর

কিছু আভাস পাওয়া যায়। গড়িয়া পূজার গানগুলি সাধারণত জারি গানের সুর ও ছন্দ অনুযায়ী রচিত। এছাড়া তাঁদের জাতীয় ভাষায় রচিত গানও আছে। গড়িয়া পূজার কিছু গানের নমুনা এখানে দেওয়া হ'ল।

উঠানের 'কেদা' বা গড়িয়ারূপী দেবতাকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করার জন্যে কাঁধে নেওয়ার আগে তাঁকে এই বলে আহ্বান করা হয় ;

আইস গো গড়িয়া, আইস গো কালাইয়া,
কোমর ধুতি ছাপ কর,
মাথার পাগড়ি ছাপ কর ;
জামা-জুমা ছাপ কর।
তারপর কাঁধে নেওয়ার পালা —
গড়িয়া রাজা বেড়াতে চায়,
উঠরে গড়িয়া —
দেশ দেশ বেড়াতে চায়,
দেশ দেশ নাচতে চায় ;
চৈত পরব শুনিয়া —
বাড়ি বাড়ি বেড়াতে চায় ;
টিলা-টংকর ভাংগিয়া —
ছাপ-ছড়া শুকাইয়া
ঢোল বাজাইল উজির নাম
খরগ হৈছে বানাইয়া
গড়িয়া অইছে বানাইয়া —
গড়িয়া রাজা চিন্তা নাই।
তার বানাইছে ছিরাংগতি — (খড়্গ)
ছিরাংগতি হাতে লইয়া ;
হাতীর দাঁতের গাম্থিয়া
ডাকের ডাকের শাড়িয়া (মোরগ চিত্রিত করা কাপড়)
ডাইক্যা আইল গড়িয়া,
বাড়ি বাড়ি নাচতে চায়
খলা (উঠান) টলা ছাপ কর।
আর এক বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়ে গাইতে থাকে, —

ঘটির জল আসিস না —
গড়িয়া রাজা বইতে চায়।

বলা মাত্র বাড়ির মালিক উঠানে কিছুটা জল ঢেলে ঠাঁই করে দেন এবং সেখানে গড়িয়া দেবতাকে স্থাপন করা হয়। সাধারণত রাত্রেই এই দেবতাকে নিয়ে প্রদক্ষিণ করা হয়। যদি কোন বাড়ির মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন গড়িয়ার সহযাত্রীগণ গায় ;

দিনে রাত চলিয়া
জল ঘটি আনস না ;
গড়িয়া রাজা বইত চায়
দুয়ার মেলিয়া তামাসা চায়
মানিলে বইত চায়
না মানিলে চলতে চায়
আইস গো খেরেংবাই
ডিমা পাইলে গড়িয়ায় দে
মোরগ পাইলে গড়িয়ায় দে
সোনারূপা বর ভইর‍্যা
ধান-সূতা বর ভইর‍্যা
টাকা-পয়সা বান্ধিয়া
গড়িয়া রাজা আসন বাদে বইত চায়।
চকি বাদে বইত চায়।

তারপর গড়িয়া রাজাকে স্থাপন করা হলে সবাই মিলে নাচের সুরে গেয়ে ওঠে;

দুয়ার মেল, ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া নাচ।
বৃত্তাকারে সবাই দাঁড়িয়ে গায় ;
সমান কর্ — সমান কর্ — সমান কর্ —।

সকলেরই হাতে থাকে একটুকরা কাপড়। ঠিক নাচ আরম্ভ করার পূর্ব মুহূর্তে সমস্বরে বলে ওঠে ;

হাতের কাপড় সমান কর —।
কে — কে — কে —।

নাচের ভঙ্গিতেই হাতের কাপড়খানা কোমরে বাঁধবার সময় বলে ;

আইয়া — আইয়া — আইয়া।

শক্ত করে কোমরে কাপড় বাঁধার পর আরম্ভ হয় তালে তালে নাচ আর গান।

মা চাইয়া ফাই মাইয়া।
মা নুংইয়া ফাই মাইয়া।
গড়িয়ানি ফাই মিছে —।
গড়িয়ানি ছেংকারাক্‌রগ।
হাতা মুইয়া চা হামিয়া
গড়িয়া বাই তং হামিয়া।

তারপর গড়িয়া দলের সঙ্গে আনা একটি ডিম ভেঙে বাড়ির মালিককে দেওয়ার সময় কর্তনকারী জিজ্ঞাসা করে — 'অ গড়িয়া ছেং- কারাকরগ্'।

তার ঘরে কি?

— ধান-দুর্বা

— 'অ গরিয়া ছেংকারাকরগ্', তার ঘরে কি?

— ঘাটি।

— 'সোনা রূপা ধান সূতা পাইছে নি'?

— পাইছে, পাইছে, পাইছে।

তারপর নাচ বন্ধ করে বাড়ির মালিকের কাছ থেকে টাকা-পয়সা ধান-চাল নিয়ে আবার গড়িয়া দেবতাকে কাঁধে করে অন্য বাড়ির দিকে রওনা হয়।

নৃত্য

রিয়াং সংস্কৃতিকে নৃত্যসমৃদ্ধ বলা যায় না। তবে বিশেষ সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সময় এরা নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। ত্রিপুরীদের মতো রিয়াংরাও গড়িয়া পূজা পালন করে। সপ্তাহকালব্যাপী গড়িয়া পূজা উৎসব পালনের সময় এরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে গড়িয়া নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। গড়িয়া নৃত্য এখন জাতীয় উৎসবের (National festival) মর্যাদা পেয়েছে — তাই প্রজাতন্ত্র দিবসে নতুন দিল্লীতে গড়িয়া নৃত্য প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

রিয়াং নৃত্যের বিশেষত্ব

রিয়াংরা সাধারণত দল বেঁধে (group dance) নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। এতে যে কোনো বয়সের নরনারী যোগদান করতে পারে। নৃত্য পরিবেশনার জন্য আলাদা-কোনো পোষাক অঙ্গসজ্জা বা অলংকারের প্রয়োজন হয় না। কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের সহযোগে নৃত্য পরিবেশিত হয়। দলবদ্ধ নৃত্য পরিবেশনের সময় নাচিয়েরা কখনো বা বৃত্তাকারে আবার কখনো বা সারিবদ্ধ হয়ে নানা রকম দেহভঙ্গিমা করে। নাচের আসরকে প্রাণবন্ত করার জন্য সময় সময় জোর হাততালি পড়ে।

দ্রুত ছন্দময়তা, আবেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ মুদ্রার রূপদান রিয়াং নৃত্যের বিশেষত্ব। এই নৃত্যে একদিকে যেমন আনন্দের বহিঃপ্রকাশ — অপরদিকে দেহের কমনীয়তাও সবিশেষ লক্ষণীয়। রিয়াং নৃত্যের বিশেষ ধরনের যে রূপ আজকাল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তা হল ভারসাম্য রক্ষার নৃত্য (balanced dance)। এই নৃত্যে বিশেষ দক্ষতা এবং শিল্পনৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। এই নৃত্য পরিবেশিত হয় মাটির কলসীর মাথার ওপর দাঁড়িয়ে। রিয়াং রমণীরা জ্বলন্ত প্রদীপ সহযোগে মাথার ওপর বোতল দাঁড় করিয়ে নানারকম দেহভঙ্গিমা করে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। এই নৃত্য হজাগিরি নামে সমধিক পরিচিত। হজাগিরি শব্দটি বাঙলার কোজাগরীর সমার্থক। লক্ষ্মীপূজার সময় হজাগিরি নৃত্য পরিবেশিত হয় বলে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার সম্পর্কযুক্ত বলে ধরা হয়। এই নৃত্যের সময় মাথার ওপর জ্বলন্ত প্রদীপসহ বোতল ছাড়া ও দু'কান বরাবর দুটো ধাতুনির্মিত চাক্‌তি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া আর্থ-সামাজিক ক্রিয়াকলাপ এবং জন্তু-জানোয়ারের আচার-আচরণ-ভঙ্গিমাও নৃত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। পশু-শিকার, মৎস্য-শিকার, বনের শাক-সবজির আহরণ, জুম সাফাই, দেহের আঘাতজনিত বেদনা, ফসল তোলা, ধান ভানা এবং দেবদেবীর প্রতি বলি প্রদান প্রভৃতি কার্যকলাপকে নৃত্যের বৈচিত্র্যময় ভঙ্গিমা বা মুদ্রার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। রিয়াং নৃত্যকে নিছক আদিবাসী নৃত্য বলে চিহ্নিত করা গেলেও এ নৃত্য বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। উপযুক্ত চর্চা এবং সংস্কারের মাধ্যমে এই সকল নৃত্যকে পরিমার্জিত রূপ দিলে আদিম রূপকে ছাড়িয়ে লোকনৃত্যের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। এই সব লোকনৃত্যের নিয়ত চর্চা ও পরিবেশনার সুবাদে সেগুলি প্রাদেশিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে জাতীয় পর্যায়ে পৌছাতে পারে।

চাকমাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও দেবদেবী

সুরেন দেববর্মন

ধর্মবিশ্বাস — চাকমাদের বিশ্বাস জগতের উৎপত্তির মূলে রয়েছে ত্রিশক্তির ক্রিয়া — বসুমতী, চুঙ্গুলাং আর পরমেশ্বরী। তাই তাঁদের সব ধর্মকর্মের সূচনা হয় স্থাপত্য পূজায়। এছাড়া তাঁরা তিপ্রাদের মত প্রধান চৌদ্দ দেবতায় বিশ্বাসী। ঐ দেবতারা হলেন বৃহত্তর, মা-লক্ষ্মী, ধালাধওয়ারী, পরমেশ্বরী, গঙ্গা, বাস্তুদেব, মত্য, হত্য, ফুলকুমারী, মেলাকুমারী, মোহিনী, কলাখেদার, ভূত, রাখুয়াল ইত্যাদি। বর্তমানে অবশ্য এতগুলি দেবদেবী নয়, শিব কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও নবগ্রহই পূজা পাচ্ছেন।

যাদুমন্ত্রের প্রভাব চাকমাদের জীবনে বড় কম নয়। চাকমাদের ধর্ম-কর্ম উৎসবানুষ্ঠানের মধ্যেও যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস নিহিত। পূজানুষ্ঠানের জন্য রাউলী নদী থেকে জল আনার সময় দুষ্ট আত্মাদের পরিহারের জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করেন। এই মন্ত্র পাঠ করলে পার্থিব শান্তি ফিরে আসে। মন্ত্রটি এখানে উদ্ধৃত হল।

"দে রে মা গঙ্গা দে রে পানি,
অউবধ মানি শুদ্ধ করাং।
শিল ভাঙি পাথর করাং,
পাথর ভাঙি দরিয়া করাং।
দরিয়া পানি কোথায় তুলাং,
অউবধ মানাই শুদ্ধ করাং।।

অর্থাৎ, হে মা গঙ্গা, মোদের জল দাও
অশুদ্ধ আত্মাকে শুদ্ধ করতে,
পাথরের চাঁইকে টুকরা করতে

আর পাথরের টুকরাকে সমুদ্র করতে,

সাগরের এক অঞ্জলি জল দিয়া

আমরা অশুদ্ধ আত্মাকে শুদ্ধ করবো।

যখন একটানা খরা চলার ফলে ক্ষেত-ফসল সব শুকিয়ে যায় চাকমারা

তখন বৃষ্টি নামানোর জন্য নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেরকম একটি অনুষ্ঠান হল ঘটা করে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া।

চাকমারা ডাকিনা বিদ্যায় বিশ্বাসী। যে এই মন্ত্র জানে চাকমা সমাজে তার খুবই প্রতিপত্তি। মন্ত্র পড়ে সে কারুকে অসুস্থ করতে বা মেরে ফেলতেও পারে বলে চাকমাদের বিশ্বাস।

দুষ্ট আত্মাকে দূর করার জন্য ও দীর্ঘমেয়াদী রোগ নিরাময় করার জন্যও মন্ত্র উচ্চারিত হয়। বশীকরণ মন্ত্র উচ্চারিত হয় ঈপ্সিতা বিবাহ ঘটানোর উদ্দেশ্যে।

চাকমা ধর্মশাস্ত্র

গোজেন লামা — গোজেন লামা চাকমা গৃহস্থদের ধর্মগ্রন্থ। গোজেন শব্দের অর্থ গুরু। এই ধর্মগ্রন্থে উপাসক গুরু বা গোজেনের কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ — এই চতুর্বিধ প্রার্থনা করেছেন। গোজেন সুতং বা গোসাঞি সূত্রের অর্থ ঈশ্বরের গীত। গোসাঞি শব্দের অর্থ ঈশ্বর। লামার অর্থ ঈশ্বর-সূত্র।

গোজেন লামার রচয়িতা উদাসী শিবচরম চাকমা কাপ্তাই-আড়াই পাহাড়ের অন্তর্বর্তী এক গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে গোজেন লামা রচনা করেন। এই উপাসনা-গীতাবলী সাতটি লামায় বিভক্ত। ত্রিপুরচন্দ্র সেন-এর মতে মূল লামার সমীকরণ করেন মনুঘাট নিবাসী মাধব চাকমা মাস্টার।

'অক্ষর চৌত্রিশা'য় সাধনভজনের উপায় বর্ণিত। রচয়িতা বালক ফকির।

আগরতারা — চাকমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের নাম 'আগরতারা'। মগ ভাষায় এর নাম ধর্মশাস্ত্র। আগরতারা সংখ্যায় ছাব্বিশটি। এটি পালি ও ব্রহ্মী ভাষায় গদ্যে-পদ্যে লেখা। প্রাচীনকালে বিবাহ বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় আগরতারা পাঠ করা হত। কেউ কেউ মনে করেন এই সব তারা চাকমা রাজা সাদেং গিরির সময়ে রচনা করা হয়। আবার কেউ মনে করেন চাকমাদের ব্রহ্মদেশে বাসকালে এগুলি রচিত হয়।

ভগবানের উদ্দেশে গীত চাকমা সালামী গান ঃ
জুজু সুগজেন চালাম জানাং তউজু।
গুগুত্যা গাছর নে সরকা গম
গজন চরণত বয় মাগং।।
ফুলে ফুলিনে আলাম দ্যং

গজেন উদিশ্যে মুই সালাম দ্যং।।
ফুলে ফুলিনে আলামত।
গজেন চরণত সালামত।।
বেঙাকঙা অদ মর চৌখভং
মুজুঙ দাত থুম মর অদসং।।
রূপে গুণে অদুংগে সাত ভেই
সাত বোন মুই পেদুংগে।।
সাত ভেই সাত বোন লাগপেদুং
বেগ ননেয়া হুলবো মুই অদুং।।
সনার দুলনত ধুলে ডাক্
পেক্ম পালনি পাসে ডাক্।।

সৃষ্টিপথম বা লক্ষ্মী পালা — সৃষ্টিপথম বা লক্ষ্মীপালা চাকমাদের অন্যতম ধর্মশাস্ত্র। এই গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব ও মর্তে লক্ষ্মীর আগমন কাহিনি আছে। দুঃখকষ্টে পড়লে চাকমা সমাজে গেংকুলী ডেকে বাড়িতে লক্ষ্মীপালার আয়োজন করার রেওয়াজ আছে। সারা রাত এই পালাগান হয়। সকালে ঘরের বাইরে উঠানে লক্ষ্মী, কালিয়া আর বিআত্রা — এই তিন দেবদেবীর বাঁশের প্রতীক তৈরি করে লক্ষ্মীকে মাঝখানে, ডান দিকে কালিয়া ও বাঁ দিকে বিআত্রার উদ্দেশ্যে ভোগ ও বলি উৎসর্গ করে গৃহস্বামী গ্রামবাসীদের ভোজ দেন।

চাকমাদের লক্ষ্মীদেবী সম্পদের দেবীমাত্র। কেউ কেউ বলেন, "মহাযান মতের দান পারমিতার ধ্যান-ধারণার প্রতীক হইতে তাহাদের লক্ষ্মীমায়ের ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দুদের লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে ইহার কোনও মিল নাই।" হিন্দু মতে লক্ষ্মীদেবীর বাহন পেঁচা কিন্তু চাকমা মতে লক্ষ্মীদেবীর প্রিয় বাহন শূকর। লক্ষ্মীদেবী সাগর থেকে মর্তে আসার সময় নাকি প্রথমে জলে কচ্ছপ ভাসে, তার উপরে বসে কাঁকড়া। কাঁকড়ার পিঠে বসে শূকর এবং শূকরের উপরে বসেন লক্ষ্মীমা।

লক্ষ্মীপালার কাহিনী হল সংক্ষেপে এই আদিতে কিছুই ছিলনা। ওঙ্কার ধ্বনির মধ্যে নিরঞ্জনের বা গোজেনের জন্ম হয়। গোজেনের ঘাম থেকে হয় সমুদ্র। সমুদ্রে বসে নিরঞ্জন নাভির ক্লেদ থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করেন। নিরঞ্জনের ছায়া থেকে জন্মায় নপুংসক কেগইয়া। নিরঞ্জন তাকে স্ত্রীলোকে রূপান্তরিত করেন। তার শরীরের রক্ত দিয়ে তৈরি হয় চন্দ্র, সূর্য ও তারকামালা। নিরঞ্জনের ডান

হাতের ক্লেদ থেকে ব্রহ্মা, বাঁ হাতের ক্লেদ থেকে বিষ্ণু ও মুখের ক্লেদ থেকে শিব জন্মান। এঁরা তিনজন কেগাইয়াকে বিয়ে করতে চান না। শেষে শিব রাজি হন এই শর্তে যে কেগাইয়াকে একশো-দশ বার জন্মগ্রহণ করতে হবে। তার শেষ বারের নাম হবে দুর্গা।

এরপর নিরঞ্জন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকে সাগর মন্থন করতে বললেন। মন্থনের ফলে যা-যা উঠলো নিরঞ্জন সেগুলিকে অঙ্কুর, শাবক, ডিম্ব — এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করলেন। এই তিন শ্রেণির বংশধরেরা ক্রমশ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

তারপর নিরঞ্জন সাতজোড়া মানুষ বানালেন। তারা ভাত খেতে চাইলে সাগর থেকে লক্ষ্মী আনার ব্যবস্থা হল। প্রথমে কালিয়া গিয়ে লক্ষ্মীকে আনতে পারলে না। তখন বিআত্রা গিয়ে নিয়ে এলেন তাঁকে। লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে আনলেন ছত্রিশ রকমের ধান। মানুষ ভাত খেতে পেল।

জীবনযাপন করতে হলে কি করা কর্তব্য ও কি করা অনুচিত তা লক্ষ্মীদেবীর মুখে এই পালাগানে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া এই পালার মধ্যে সাধারণ গৃহস্থালী বা কৃষিকাজ সম্বন্ধে এমন অনেক তথ্য আছে যা থেকে চাকমাদের জীবন-চর্চা ও ধ্যানধারণা সম্বন্ধে অনেক অজানা খবর পাওয়া যায়। দেবরক ফুল, জর্গনা ফল, দগড় ও ধুদক বাজনা, আমপাতায় লেখার খবর, ধলকুড়া, তিতির, মাছরাঙা, মদনা, তোতা, কয়, উড়িক, বাত্তুআ, বুলবুলি, সালেইয়া প্রভৃতি পাখির নাম, আজুরা ও জগুরা প্রভৃতি মদের নাম, নানা মাছের নাম ও ধরার কৌশল, জুম চাষের পদ্ধতি, গঙ্গা পূজায় পাঁঠা বলি দেওয়ার আগে মঙ্গলামঙ্গল পরীক্ষা, মেজাং নামে ছিদ্রযুক্ত কড় টুকরি ও ছিদ্রহীন লাই টুকরি, সান্না পিঠা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা তথ্যে লক্ষ্মীপালা সমৃদ্ধ।

দেবদেবী

চাকমাদের ধর্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ — এই দুই ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ও কৌল ধর্মানুষ্ঠানের সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে মনে হয়। ভূতপ্রেত সম্বন্ধে তাঁদের সংস্কার খুবই প্রবল। চাকমা সমাজে ওঝাই এর খুবই প্রতিপত্তি, কারণ ভূতপ্রেত ইত্যদিকে তুষ্ট রাখার অনুষ্ঠান ওঝাই সম্পন্ন করেন। আর বৌদ্ধ ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদিত হয় রাউলী বা ঠাকুরের সহায়তায়। এছাড়া আছেন জুমের, বনের ও নানা অসুখ-বিসুখের দেবদেবী। তাঁদের সকলকে পূজা দিয়ে পরিতুষ্ট করতে হয়। চাকমারা শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতীর পূজা দেন।

কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবীয় চিন্তাধারাও যে অনুপ্রবেশ করেছে তা গলায় তুলসীর কণ্ঠী থেকেই অনুমান করা চলে।

চুঙ্গুলাং পূজা — চাকমাদের বিভিন্ন পূজাপার্বণের মধ্যে চুঙ্গুমাং পূজা খুবই উল্লেখযোগ্য। এই পূজার উল্লেখ করা হয়েছে আগেই। এই পূজার সঙ্গে মগদের চুম্মুঘ পূজার সাদৃশ্য আছে। এই পূজায় লাগে একটি শূকর, ৪টি মোরগ ও একবোতল মদ।

বুর্‌ পারা পূজা — এই পূজার আয়োজন গৃহস্থের মঙ্গল কামনায়। এ পূজার অন্য নাম 'মাথা ধোওয়া'। ওঝাই নদীর ধারে বছরের প্রথম দিকে পূজা করেন। পূজা হয় সাধারণত ফুল দিয়ে।

পরমেশ্বরী ও মেদ্দনীপুরুষের পূজা — এই দুই দেবদেবীর পূজার বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। পূজার উপকরণ চুঙ্গুলাং পূজার অনুরূপ।

ধর্মকাম পূজা — ধর্মকাম একটি বড় যজ্ঞপূজা। এই পূজায় রাউলী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রয়োজন হয়। উপকরণ ঃ একটি শূকর, হাঙ্গর মাছের শুঁটকী ও পিঠা। এই পূজা খুব সাবধানে করতে হয়।

অয়্যাপূজা — এই পূজায় একটি শূকর ও ২০/২২টি মোরগ লাগে।

লংতরা পূজা — এই পূজায় লাগে মদ এক বোতল, শুকর বা ছাগল একটি ও তিনটি মোরগ। কোথাও শুধু ফুল দিয়েও পূজা হয়।

একরাত্যা — দক্ষিণের শিলাছড়ি অঞ্চলে 'এক রাত্যা' নামে শিবপূজার প্রচলন আছে। এই পূজার সময় তুষের উপর শূকরকে বলি দেওয়া হয় গোপনে, যাতে রক্তের চিহ্ন না দেখা যায়। মাংস ছাড়াও মদও দেওয়া হয়।

কার্তিক মাসে নবান্ন উপলক্ষে শূকর ও ছাগল বলি দিয়ে মা লক্ষ্মীরও পূজা হয়।

বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠান — বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে চৈত্র সংক্রান্তিতে 'মহা বিষু' পর্বে বড় আনন্দ-অনুষ্ঠান হয়। ঐদিন কেউ কাজ করেন না। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ দান করেন। কাঠি পূর্ণিমায় হয় কঠিন চীবর দান উৎসব। বৈশাখী পূর্ণিমায় বৌদ্ধ জয়ন্তী।

বিশুপর্বে সকলে ভাল কাপড় জামা পরে পরস্পরের হাত ধরে শোভা-যাত্রা

করেন। প্রত্যেকের হাতে থাকে একটি করে পাখা। তারপর বুদ্ধের চরণে নৈবেদ্য দিয়ে বাতি জ্বালাতে হয়। পরের দিন হয় 'থামিটং' (অন্নকূট জাতীয়) তৈরি ও 'তাঙ্গানটসারগা' বা পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান। 'চক্রব্যূহ' হল আর একটি বৌদ্ধ উৎসব। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পবিত্র জ্ঞানে রাউলীদের ভোজ দেওয়া হয়।

চাকমাদের বিজু উৎসব ও নৃত্য

আসামের বিহু, ত্রিপুরার বিষু, বাঙলার চৈত্র-সংক্রান্তির সংগোত্রীয় বর্ষবিদায় উৎসব চাকমাদের বিজু উৎসব। বর্ষবিদায়কে কেন্দ্র করে প্রত্যেক জাতি-উপজাতির সমাজে এই জাতীয় উৎসব পালনের রেওয়াজ প্রচলিত হয়ে আসছে অনাদিকাল থেকে। বিজু উৎসব চাকমাদের সামাজিক উৎসব। প্রকৃতপক্ষে বাঙলার সুবিদিত চৈত্র-সংক্রান্তি নামক বর্ষবিদায় উৎসবেরই সংস্করণ চাকমাদের বিজু উৎসব। তবু বিজু উৎসব বাঙলার চৈত্র-সংক্রান্তির অনুকৃত পর্ব বলে আখ্যা দিতে চাইছি না। কেননা উন্নত-অনুন্নত জাতি ও উপজাতির নিজস্ব সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান রয়ে গেছে। বিজ উৎসবও চাকমাদের নিজস্ব সামাজিক আচরণবিধি। এই উৎসব চাকমা সমাজে সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিজু উৎসব জাতীয় বর্ষবিদায় উৎসব শুধু ভারতের পূর্বাঞ্চলে পালিত হয় তা নয় — ভারতের পূর্ব-প্রতিবেশী রাষ্ট্র ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানান জায়গায় এ জাতীয় উৎসবের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা ছাড়াও মগদের অন্যতম শাখা বড়ুয়া সম্প্রদায়ও বিজু উৎসব পালন করে থাকে। ব্রহ্মদেশে 'জলউৎসব' নামক একটি আড়ম্বরপূর্ণ যে পার্বণটি পালিত (Water festival) হয়ে থাকে তা চাকমাদের বিজু উৎসবের সমশ্রেণীর উৎসব। তবে বিজু উৎসবের প্রকৃতি যে একটু ভিন্নতর বা অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তা উৎসবের প্রকৃতি থেকে বোঝা যায়। কেননা বিজু উৎসব নিছক বর্ষবিদায় উৎসব নয় — এই উৎসবে বর্ষবরণের ডালিও সাজানো হয়। তাই বিজু উৎসব দ্বিমুখী উৎসব পার্বণ। একদিকে পুরাতনকে বিদায়, অন্যদিকে নতুনকে স্বাগত জানানো — এই দ্বিবিধ প্রকৃতির বিজু উৎসব চাকমা সমাজে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিজু উৎসব পালিত হয় চারদিন দরে — পুরাতন বছরের শেষ দু'দিন এবং নূতন বছরের প্রথম দু'দিন। তবে বছরের শেষ দিনটিই বিজুর মূল উৎসব। এই দিনটিকে বলা হয় 'মূলবিজু'।

মূলবিজুর উৎসবের সূচনা হয় আগের দিন থেকে। প্রাক্-মূলবিজুর দিনটিকে 'ফুলবিজু' বলা হয়। এই বিভাজনে মূলত-হিন্দু বাঙালি ও ত্রিপুরী সমাজে পালিত চৈত্র-সংক্রান্তির চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়।

চাকমাদের বিজু উৎসব পালনের সঙ্গে ত্রিপুরীদের বিষু উৎসব পালনের মিল রয়েছে। ত্রিপুরীরা চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে (বিষু উৎসব) বাল-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী সবাই প্রাতঃকালে স্নান সেরে নতুন পোশাক পরে গুরুজনদের প্রণাম করে আশীর্বাদ লাভের রেওয়াজ রয়েছে। চাকমারা একই নিয়ম পালন করে থাকে। ত্রিপুরীদের মতো চাকমাদেরও এ দিনে গৃহপালিত পশুদের বিশেষ করে গরু ও মহিষকে স্নান করিয়ে বন্য ফুল সংগ্রহ করে মালা গেঁথে পশুর গলায় ও শিং-এ পরিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ পরিলক্ষিত হয়। ঐ দিনে সাধারণত কেউ পশুপাখি বধ করে না।

ফুলবিজুর দিনে অনেকেই নদী বা জলাশয়ের তীরবর্তী স্থানে প্রদীপ জ্বালিয়ে 'গঙ্গামা'কে প্রণাম জানায়। এই পার্বণের ভেতর চাকমাদের সরল ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে নিসর্গ পূজার নিদর্শন ফুটে ওঠে।

বিজু-দিনগুলিতে লোক-সংস্কৃতির উৎসব-অনুষ্ঠানও উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। নিঝুম মধ্যাহ্নকাল মুখর হয়ে ওঠে গিলা খেলা, নাদেং খেলা, বদাবদি (কুস্তি) খেলায়। জ্যোৎস্নারাত ফুটে উঠলে গুদু খেলা ও ফর খেলায় মেতে ওঠে চাকমারা।

মূলবিজুর দিনে শিশুদের খাবার ব্যবস্থা করার রীতি প্রচলিত আছে। ঐ দিনে শিশুরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে নানারকম পিঠা খেয়ে আনন্দলাভ করে। শহর অঞ্চলে সিরাপ, স্কোয়াশ্, মিষ্টি, মোয়া, জিলাপি ও বিস্কুট ইত্যাদি দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। ঐ সময় প্রতি বাড়িতে 'পাচন' প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

তবে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিজু উৎসবের প্রকৃতিও বদলে যাচ্ছে। আধুনিক সমাজের সংস্কৃতিমেলা ও শিল্পমেলার অবয়বে বিজু উৎসব আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে — বিশেষত শিক্ষিত চাকমা যুবক-যুবতীগণ — বিজু মেলাকে আকর্ষণীয় করার জন্য প্রাচীন খেলাধূলা ও কল্পতরু নিয়ে বিজুনৃত্য পরিবেশনার পাশাপাশি আধুনিক ভঙ্গিতে বিজুগীত, কবিতা আবৃত্তি, হস্তশিল্প প্রদর্শনী, নাট্যানুষ্ঠান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক উপকরণসমূহকে উপস্থাপিত করে বিজু

উৎসবকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। এতে বিজু উৎসবের সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের শ্রীবৃদ্ধিও ঘটেছে।

বিজু নৃত্য (চাকমা)

চাকমা নরনারী অত্যন্ত আনন্দপ্রিয়। নাচ ও গান এদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো চাকমারা চৈত্র-সংক্রান্তির উৎসব পালন করে থাকে। বছরের শেষে পুরাতন বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে স্বাগত জানাবার রীতি প্রচলিত আছে। বিজু নৃত্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে বাঁশির সুরে সুরে পরিবেশিত হয়। চাকমাদের বর্ষবরণ-উৎসব তিনদিনব্যাপী হয়। বর্ষবরণ উৎসবের সময় চাকমা যুবতীরা দলবদ্ধ হয়ে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে।

গারোদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৃত্য কলা

সুরেন দেববর্মন

ধর্মীয় বিশ্বাস — গারোরা মূলত জড়বাদী। হিন্দুধর্মের প্রতিও এদের বিশ্বাস আছে। তবে বিপুল-সংখ্যক গারো আমেরিকার ব্যাপটিস্ট এবং রোমন ক্যাথলিকদের প্রভাবে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে গারোদের প্রচলিত ধারণা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত। তাদের মতে পৃথিবীর উৎপত্তির আগে পাহাড়-পর্বতের পরিবর্তে শুধু জল আর জল ছিল। গারোদের বিশ্বাস — সর্বময় ঈশ্বর 'তাতারা রবুংগা' জলময় পৃথিবীকে কঠিন মাটির স্তরে পরিণত করেছেন। 'তাতারা রবুংগা হিন্দুদের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সমতুল। কথিত আছে, আদিপিতা 'তাতারা রবুংগা' অধস্তন 'নেস্ত-নৌপতু'কে নির্দেশ জারি করে গুবরে পোকার সাহায্যে জলের তলদেশ থেকে একমুঠো কাদা এনে মাটির পৃথিবী তৈরি করেন। গারোরা মনে করে বানর ও ব্যাঙ হল পৃথিবীর সর্বপ্রথম সৃষ্ট জীবন। মনুষ্য প্রাণী পৃথিবীতে সকলের শেষে এসেছে বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। খ্রিস্টানদের আদি মানব-মানবী 'আদম-ইভ'-এর মতো গারোদের আদি মানব-মানবী হল 'সানি ও মুনি' — তাদের পুত্র-কন্যা হল গাং চং এবং দাজং। গাং চং এবং দাজং হল নর ও মান্ডের মা-বাবা। নর ও মান্ডে হল গারোদের আদি মাতা-পিতা।

গারোদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী — আবার অনেকে সর্বেশ্বরবাদী। গারোরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তাদের ধারণা, পাপ কাজ করলে পরজন্মে পোকামাকড়, গাছপালা হয়ে জন্মলাভ করতে হয়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর 'তাতারা রবুংগা' (জগতের স্রষ্টা) ছাড়া গারোদের আরও অনেক দেবতা রয়েছে। যেমন চোরাদুবী (শস্য দেবতা), সালজং (উর্বরতার দেবতা), গোয়েরা (শক্তির দেবতা), সুনসিমা (ধনের দেবতা)। কালকামে (গোয়েরার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) মনুষ্য প্রাণীদের দেখাশুনা করেন। আসিমা-দিংসমা-সুসিমার মাতা। তংগ্রেংমা (রোগ শোকের দেবী), নাওয়াং (মানুষের অনিষ্টকারক দেবতা)।

তাছাড়া গারোয়া সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করে থাকে। তাদের বিশ্বাস, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, ভূমিকম্প এবং ঝড়ঝঞ্ঝা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের

মূল কারণ ঐ গ্রহ-নক্ষত্র। তাই তাদের পূজা-অর্চনা নিবেদন করে খুশি রাখতে হয়। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির কারণও ঐ সমস্ত অদৃশ্য শক্তিসমূহ — যাদের উদ্দেশে পশুপাখি বলি দিতে হয়। খেত-খামারের সুফল লাভের জন্য দেবতার প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন এবং রোগশোকের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য দেবদেবীর স্মরণ করতে হয়। কোনো ব্যক্তির অসুখ-বিসুখ করলে পারিবারিক পূজা এবং সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য সর্বজনীন পূজা দিয়ে বিপদ-আপদ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্তি পাবার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

কৃষিনির্ভর গারোদের জীবনে ফসল লাগানো এবং ফসল তোলার সময় নানারকম উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। ফসল তোলার সময়কার উল্লেখযোগ্য উৎসবকে বলা হয় ওয়াংলা উৎসব। এই উৎসবের সঙ্গে আসামের ভোগালী বিহুর তুলনা করা চলে। ওয়াংলা উৎসব কয়েকদিন ধরে উদ্‌যাপিত হয়। সঙ্গে চলে নাচ-গান এবং পান-উৎসব। এই উৎসবের সিংহভাগ ব্যয় নির্বাহ করে গ্রামের মোড়ল বা নকমা। হিন্দুদের মতো গারোরাও পূর্ব পুরুষদের স্মরণ করে। — শ্রদ্ধা নিবেদন করে। মৃত ব্যাক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করে। গারোদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান দেখে সহজে অনুমান করা যায় যে তাদের ভেতর প্রতিবেশী হিন্দু উপজাতিদের প্রভাব প্রচুর পরিমাণে বিস্তার করেছে।

গারোদের পূজিত আরো দেবদেবী

হবা চুয়া রদ্দা (জুমদেবতা)

গারোরা একান্ত বিশ্বাস করে, জুমদেবতা হবা চুয়া রদ্দাকে তুষ্ট না রাখলে ভাল ফসল পাওয়া যায় না। তাই সাতটি মোরগ বলি দিয়ে জুমদেবতার উদ্দেশ্যে সান্ধ্যপূজা দেওয়া হয়। এই পূজা কামাল (পুরোহিত) দ্বারা সম্পন্ন হয়।

গয়রা পূজা (স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র-পূজা)

সনাতনী হিন্দুদের প্রচলিত বিশ্বাস মতে স্বর্গের দেবতা ইন্দ্রের অস্ত্র 'বজ্র' মর্ত্যবাসীদের পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ। গারোরাও এই মতে বিশ্বাসী। তাই গয়রা পূজা করে ভয়ংকর অস্ত্র বজ্রের হাত থেকে নিস্তার পেতে গারোরা সর্বদাই সচতেন। প্রতি বছর ঘরে ঘরে এই পূজার প্রচলন রয়েছে। শূকর, মুরগী প্রভৃতি বলি দিয়ে এ পূজা করা হয়। এই পূজা জুমখেতে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার জায়গায় ভোজ দিতে হয়। পূজার জন্য পুরোহিতকে (কামাল) দক্ষিণা দিতে হয়।

রংচুগালা (জুমদেবী)

পূর্বে বর্ণিত 'হবা চুয়া রদ্দা' ছাড়াও আর একটি জুমদেবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হবা চুয়া রদ্দার মতোই রংচুগালা দেবীও সুফলের দেবী। সুফল প্রাপ্তির জন্য রংচুগালার উদ্দেশ্যে মুরগি, মদ ও লেবু উৎসর্গ করতে হয়। গ্রামের মোড়লের (নক্‌মা) বাড়িতেই এই পূজা সম্পন্ন করা হয়।

ওয়াংগালা (সম্প্রদায় পূজা)

ওয়াংগালা গারোদের সর্বজনীন পূজা। তাই সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ এ পূজায় যোগদান করে থাকে। আশ্বিন মাসে এই পূজা দেওয়া হয়। তিন দিন এই পূজা হয়। মোড়ল বা নক্‌মার বাড়িতে এই পূজা শুরু হয়। পূজার শেষে খুব জাঁক-জমক সহকারে ভোজ-পর্ব সম্পন্ন করা হয়। গারোরা বিশ্বাস করে, ওয়াংগালা পূজা করলে অজানা বিপদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। মদ, শূকর এবং মুরগি হচ্ছে এ পূজার মূল উপচার। ফসল তোলার শেষে এ পূজা দিতে হয়। এই পূজা না দিলে নূতন ধানের ভাত খাওয়া যায় না। এটাকে পল্লী বাঙলার নবান্ন উৎসবের।

নৃত্যকলা ও উপজাতীয় সংস্কৃতি

নৃত্যকলা উপজাতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উপজাতীয় সমাজে নৃত্যকলার চর্চা শুরু হয়েছিল সঙ্গীত চর্চার অনেক আগে। সঙ্গীত ও নৃত্যের চর্চা নিছক অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত না হয়ে জীবনের প্রয়োজনের তাগিদেই এই দ্বিবিধ কলাবিদ্যার জন্ম হয়েছিল। সঙ্গীত ও নৃত্যকলা জীবনের স্পন্দন এবং যাদুকরী শক্তির উৎস। এই শক্তি সঞ্চয় করে উপজাতিদের প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত শক্তির বিরুদ্ধে টিকে থাকতে হয়। বলতে গেলে সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমেই অতিপ্রাকৃত অঘটন ঘটন-পটীয়সীদের নিয়ন্ত্রণে রাখার মানসিক শক্তি অর্জিত হয়। সঙ্গীত ও নৃত্যকলার মাধ্যমে দেবতাদের রোষ-বহ্নি নির্বাপিত হয়। দেবতারা খুশি হয়ে ক্ষণজীবী ভক্ত মানুষদের কিয়ৎ-পরিমাণ শক্তিও দান করেন। দেবতাদের অনুকম্পা লাভ করে উপজাতীয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বর্ষিত হয়। আদিবাসী নৃত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে খ্যাতনাম্নী নৃত্য বিশারদ শ্রীমতী গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় বলেছেন —

আদিবাসীদের নৃত্য ও সংস্কৃতির মূল্য যাচাই করতে গেলে তাদের জীবনের

গুণগত মান, সামাজিক গঠন এবং মানসিক শক্তির বিষয়ে বোধগম্য হতে হবে। আদিবাসীরা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে চায়। কর্মময় জীবন এবং অবসর বিনোদন এ দুটোকে আলাদাভাবে দেখতে তারা নারাজ। নৃত্যকলাকে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যম হিসাবে তারা গণ্য করে। জীবন ও জীবিকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল নৃত্য। আদিম যুগে নৃত্যকলা জীবন ধারণের সহায়ক বলে পরিকল্পিত হত। সে যুগে নৃত্যকলা জীবন সংগ্রাম ও উন্নতি সাধনের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সেই আদিম যুগে নৃত্য পরিবেশনা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণবন্ত এবং উৎসাহব্যঞ্জক — তাদের নৃত্যভঙ্গিমা প্রায়শই পশুপাখির স্বাভাবিক চলনভঙ্গি থেকে অনুকৃত। রুষ্ট দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করতে, মহামারী রোধ করতে, বৃষ্টিপাত ঘটাতে অথবা শিকার ধরার প্রেরণার মুখ্য মাধ্যম হিসাবে নৃত্য পরিবেশনা অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হত। আদিবাসী নৃত্যের মুদ্রা রচিত হয় অনেক সময় পশুপাখির চলন-ভঙ্গির অনুকরণে। ত্রিপুরীদের গড়িয়া নৃত্যেও মুরগির নানান ভঙ্গি অনুকৃত।

গারোদের নৃত্য

গারোদের সামাজিক জীবনে নৃত্য ও পানীয় সঙ্গীতের পরিপূরক উপকরণ। এই প্রসঙ্গে বিশ্বখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ডক্টর ভেরিয়ার এলুইন বলেছেন — অধিকাংশ উপজাতিদের সমাজে দ্বিবিধ নৃত্যরীতি প্রচলিত। একটি আনুষ্ঠানিক অপরটি বিনোদনমূলক। আনুষ্ঠানিক (Ceremonial) নৃত্য শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বিনোদমূলক (recreational) নৃত্য যুবক-যুবতীরা নিজেদের আনন্দ-বিধানের জন্য পরিবেশন করে থাকে। গারো সমাজেও এই দ্বিবিধ নৃত্য প্রচলিত আছে। গারো সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর সামাজিক অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। সামাজিক অনুষ্ঠানের শেষে পান-ভোজন, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। গারো সমাজে প্রচলিত নৃত্যগুলির মধ্যে লোকনৃত্য, রণনৃত্য এবং আরো নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে পরিবেশিত নৃত্যগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নেতা নির্বাচন (গানা), পশুবলির বেদিতে, বার্ষিক পূজা-পার্বণে এবং কৃষিকাজে অথবা মৃতব্যক্তির সৎকারে নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। তাছাড়া গৃহপ্রবেশ ও যুবক-আবাস-উদ্বোধন উপলক্ষ্যেও নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে।

গারোদের অধিকাংশ নৃত্যভঙ্গিমা পশুপাখির চলন ও ওড়ার ভঙ্গি থেকে অনুকৃত। প্রকৃতির বিভিন্ন ভাবমূর্তিও ফুটিয়ে তোলা হয় নৃত্যের মাধ্যমে।

গারো সমাজে প্রচলিত নৃত্যগুলি সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গানানৃত্য (নেতা-অভিষেক নৃত্য)

গারো সমাজে নেতা বা প্রধান আনন্দময় নৃত্যের পরিবেশনার মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। প্রথমে নেতাকে আংটি পরানো হয়ে থাকে — আংটিই হচ্ছে নেতৃত্বের প্রতীক। এই অভিষেক নৃত্যে পুরোহিতের নির্দেশে সমাজের গণ্যমান্য সবাই যোগদান করে থাকে। আংটি পরার পর নেতা সপত্নী নৃত্য পরিবেশন করে থাকে।

রণ নৃত্য

রণনৃত্য দলবদ্ধ নৃত্যবিশেষ। একসঙ্গে কুড়ি থেকে ত্রিশজন লোক একে অপরের পিছনে দাঁড়িয়ে পরস্পরের কোমর ধরে গোল হয়ে এক পায়ের ওপর ভর করে লাফাতে লাফাতে গান করতে থাকে। রণনৃত্যে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করার জন্য মাদল ও পিতল নির্মিত ঘণ্টা বাজানো হয়। স্ত্রীলোকেরাও এই নৃত্যে যোগদান করে থাকে — তবে পুরুষদের কাছ থেকে অনতিদূরে সারিবদ্ধ হয়ে এক পায়ের ওপর ভর করে দুবাহু প্রসারিত করে কখনো বা পরপর বাহু দুটি ঊর্ধ্বে প্রসারিত করে ঘুরে ঘুরে বাদ্যযন্ত্রের ঝংকারের তালে তালে নাচতে থাকে।

সাধারণত প্রতিটি নাচের দলে একজন দলপতি থাকে। দলপতি তরবারি এবং বর্ম হাতে নিয়ে কাই সুর তুলতে থাকে। রণনৃত্যকে গারো ভাষায় গ্রিকা বলা হয়। দলপতিকে গ্রিকগিপা বলা হয়। এই নৃত্যকে নিঃসন্দেহে প্রাচীন যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহের স্মৃতির রেশ হিসেবে দর্শকের সামনে শৌর্য-বীর্যের প্রতীক রূপে উপস্থিত করা হয়।

দোক্রু সোয়া নৃত্য

এই নৃত্য একমাত্র নারীদের দ্বারা পরিবেশিত হয়ে থাকে — পুরুষদের জন্য এই নৃত্য নিষিদ্ধ। এই নৃত্যে দুজন স্ত্রীলোক যোগদান করে। কপোত-কপোতীর প্রেমনিবেদন ও খাদ্যগ্রহণ-ভঙ্গিমা এই নৃত্যের মুদ্রার বিশেষত্ব। দুজন স্ত্রীলোক কপোত-কপোতীর মতো দুদিক থেকে নেচে নেচে এসে মুখোমুখী দাঁড়ায়। অতঃপর বাঁ হাত কোমরে রেখে ডান হাত মাটিতে হঠাৎ ছুঁড়ে দেয় ঠিক যেভাবে কপোতরা মাটি থেকে খাবার ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে থাকে। এই সময় পা দুটোকে পাখির পশ্চাদভাগের মতো বাঁকিয়ে রাখা হয়। যে কোনা সামাজিক অনুষ্ঠানে এই

নৃত্য পরিবেশিত হতে পারে।

আমবারে রুরুয়া নৃত্য (কুলগাছ ঝাঁকানোর নৃত্য)

ফলন্ত গাছকে ঝাঁকুনি দিয়ে যেভাবে ফল পাড়ে, সেরকম ভঙ্গিমা এই নৃত্যে প্রদর্শিত হয়। নারীরাই এই নৃত্যে যোগদান করে। দুজনের বেশি এই নৃত্য পরিবেশনায় প্রয়োজন হয় না। নৃত্যের সময় একজন হঠাৎ নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে কম্পমান গাছ থেকে ঝরে পড়া ফলের ভঙ্গিমা নিয়ে নৃত্য করতে থাকে। অপর জন হঠাৎ নৃত্য বন্ধ করে দিয়ে ফল কুড়ানো ভঙ্গিতে থমকে দাঁড়ায়। এই সময় সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের মহড়া যুগপৎ চলতে থাকে।

কিলপুয়া নৃত্য (কার্পাস রোপণ নৃত্য)

কার্পাস বপন করতে হলে যেভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়, ঠিক সেভাবে নৃত্যের তালে তালে নৃত্যরতা গারো রমণীরা সামনে ঝুঁকে পড়ার ভঙ্গি করে — মনে হয় মাটিতে গর্ত খুঁড়ে কার্পাস বীজ বপন করে যাচ্ছে। কিলপুয়া নৃত্য চৈত্র-বৈশাখ মাসে পরিবেশিত হয়ে থাকে। নৃত্য পরিবেশনের প্রাক্‌কালে পশু বলি দিয়ে নৃত্যের সূচনা করা হয়। ফসল বৃদ্ধির দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য। পুরুষ নারী নির্বিশেষে এই নৃত্যে যোগদান করে।

মগদের ধর্মীয় উৎসব

সুরেন দেববর্মন

উৎসব-অনুষ্ঠান

মগরা খুব উৎসবপ্রিয়। উৎসবের মেজাজের মধ্যে তারা তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রাকে ভরপুর করে রাখে। নিম্নবর্ণিত উৎসব এবং সামাজিক রীতি-নীতির বহর থেকে তা সহজে অনুমেয়।

নৌকা খেলার উৎসব

আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এই উৎসব পালনের মাধ্যমে তারা ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করে থাকে। এই দিনে মগরা নারীপুরুষ দলে দলে বুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে প্রণাম জানায় — এবং সন্ধ্যালগ্নে নদীর তীরে দলে দলে গিয়ে খেলনা নৌকা ভাসায়। নদীর ভাঁটার দিকে খেলনা নৌকা ভাসানো তাদের ধর্মীয় উৎসব। খেলনা নৌকা ভাসানোর সময় গলাবাজি, গান ও হাততালি দেওয়া হয়। তাদের মতে বুদ্ধদেব অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে আলো নিয়ে যাত্রা করেন। কাঠের নির্মিত নৌকাগুলো বিচিত্র রং-বেরংয়ে কাগজ ও অলংকৃত ঝালর দিয়ে সাজানো হয়। নৌকাগুলোর ভেতরে অতি সযত্নে জ্বলন্তে মোম বসিয়ে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

জল উৎসব

মগদের জল উৎসবের সঙ্গে হিন্দুদের হোলি বা দোল উৎসবের মিল রয়েছে। এই উৎসব চৈত্র মাসের শেষে পালিত হয়। কচি ছেলেমেয়ে ও যুবক-যুবতীরা এই উৎসবে মেতে ওঠে। এরা দলে দলে রাস্তায় বেরিয়ে একে অন্যের গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়। হিন্দুদের দোল উৎসবে যেভাবে রং মাখামাখির যে মেজাজ, মগদের জল উৎসবেও তা দেখা যায়। জল খেলার সময় আনন্দোচ্ছল ধ্বনি, ছোটাছুটি, আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ চরমে ওঠে। মগ সম্প্রদায়ের লোকজনও পথে বেরিয়ে পড়লে তাদের গায়েও জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এতে কেউ কিছু মনে করে না।

ব্যূহচক্র উৎসব

এই খেলাটি মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের পুত্র বীর অভিমন্যুকে বধ করবার জন্য কুরুপক্ষের ব্যূহ রচনার কথা মনে করিয়ে দেয়। এই ব্যূহখেলা মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয়। মগদের অত্যন্ত উপভোগ্য এবং আনন্দের এই উৎসব তিন-চার দিন ধরে চলে। ব্যূহচক্র বাঁশের বেড়া দিয়ে রচিত হয় আঁকাবাঁকা গোলকধাঁধার অভ্যন্তরীণ পথ। এই চক্রের দুটো মুখ, একটা প্রবেশ করার, অপরটি বেরিয়ে যাবার। ব্যূহচক্রে একবার প্রবেশ করলে পরিবেষ্টিত সম্পূর্ণ পথ অতিক্রম না করে কেউ বেরুতে পারে না। অভ্যন্তরীণ আঁকাবাঁকা পথে বুদ্ধমূর্তিও রাখা হয়। ব্যূহচক্র পরিক্রমা করার সময় প্রতিটি মূর্তির সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে সকলে ভক্তিভরে প্রণতি জানায়। বুদ্ধমূর্তির বেদিতে মোম জ্বালিয়ে ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা যায়। ব্যূহচক্রে প্রবেশ-পথ অন্ধাকারাচ্ছন্ন রাখা হয় — কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ থাকে আলোকিত। এই উৎসবের দিনগুলিতে নৃত্য পরিবেশনা এবং পুতুল নাচের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকে।

মগনৃত্য

সুরেন দেববর্মন

মারমা বা মগনৃত্য

মারমা সমাজের সঙ্গীতের শ্রেণিবিভাগ যেমন রয়েছে তেমনি নৃত্যকলারও শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। মোটামুটিভাবে মারমাদের পাঁচ প্রকার নৃত্য প্রচলিত আছে।

১। **ক্যংমুই ঃ** ক্যংমুই নৃত্য মারমাদের আদিমতম নৃত্যকলা বলে পরিগণিত। আদিকালে নৃত্য কলার সৃষ্টির পূর্বে মারমারা ধান ভানার ঢেঁকির শব্দ ও তালের ছন্দ ও গতির মধ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যের রূপ আবিষ্কার করে। পুরাকালে এই নৃত্য পরিবেশনকালে অনেকগুলো ঢেঁকির শব্দের সঙ্গে তাল সৃষ্ট নৃত্য পরিবেশন করার রীতি ছিল — পরবর্তীকালে ঢেঁকির পরিবর্তে বাঁশের মাধ্যমে শব্দ ও তাল সৃষ্টি করে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও গতিময় করে তুলতে দেখা যায়।

২। **সইং ঃ** সইং নৃত্য পরিবেশিত হয় কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বা ধর্মীয় নেতা বা রাজার মৃত্যু উৎসবে। মৃতব্যক্তির কফিন বয়ে নিয়ে যাবার সময় শবযাত্রীরা বিভিন্ন নৃত্যদলে কাঠি হাতে নিয়ে সইং নৃত্য পরিবেশনার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই নৃত্যে ৩২ প্রকার মুদ্রা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩। **য়ইং ঃ** এই নৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য নানারকম দেহ-ভঙ্গিমা প্রদর্শন। য়ইং নৃত্যে হেলেদুলে পরিবেশিত নৃত্য কৌশল দর্শকদের মুগ্ধ করে বলে এর নাম য়ইং। এই নৃত্য একক, দ্বৈত কিংবা সমবেতভাবে পরিবেশিত হতে পারে।

৪। **ছিমুইং ঃ** ছিমুইং আকা বাংলাদেশে প্রদীপ নৃত্য বলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। মূলত এই নৃত্য বিবাহে পার্বণে বর-কনে উভয় পক্ষের পিতামাতা ও গুরুজনদের সম্মানার্থে পরিবেশিত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে ধর্মীয় পূজা পার্বণেও এ নৃত্য পরিবেশিত হয়।

৫। **বাইং ঃ** আধুনিক সমাজের নৃত্যকলার অনুকরণে এই নৃত্যের উদ্ভব। এই নাচকে মারমাদের মুখোশ নৃত্যও বলা যায়। কেননা অনেক সময় বানর, বাঘ কিংবা অন্যান্য জন্তুর মুখোশ ধারণ করে এই নৃত্য পরিবেশিত হয়।

হালামদের ধর্ম পূজা-পার্বণ ও নৃত্য

সুরেন দেববর্মন

ধর্মীয় জীবন ও পূজা-পার্বণ

নানা দেবতা ও উপদেবতার প্রতি বিশ্বাস ও ভীতিকে কেন্দ্র করে অন্যান্য আদিম উপজাতিদের মতো হালামদের ধর্মীয় জীবন অনুসৃত। তাই সরলকথায় হালামদের ধর্মকে সর্বপ্রাণবাদ এবং বহুদেবদেবীর প্রতি বিশ্বাসের ধর্মও বলা যেতে পারে। হালামদের আদিধর্মের স্বরূপই হচ্ছে কতকগুলি প্রাকৃতিক অলৌকিকতায় বিশ্বাস এবং আচারগত অনুষ্ঠান। যথা, বনবাদাড়ে দেবতা ও উপদেবতার অস্তিত্ব, উর্বরাশক্তির পূজা, যাদুবিদ্যা ও ডাকিনীবিদ্যার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও তাদের কাছে আত্মসমর্পণ। প্রাণ বা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস হালামদের ধর্মীয় আচরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে রয়েছে। হালামদের বিশ্বাসভূমিতে আত্মার অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকাণ্ড অত্যন্ত ক্রিয়াশীল — মানব-জীবন, পশুপাখি ও গাছপালার মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব বর্তমান বলে হালামদের বিশেষ ধারণা। হালামদের বিশ্বাসমতে ঘুমন্ত অবস্থায় আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে পড়ে। এই আত্মা শরীর থেকে নির্গত হওয়ামাত্র ফড়িং-এর রূপ ধারণ করে দূর-দূরান্তে পরিক্রমা করে প্রভাত-লগ্নের পূর্বেই আবার ফিরে এসে শরীরে প্রবেশ করে। এই বিশ্বাসের জন্য সন্ধ্যের পর হালামরা কোনো ফড়িং হত্যা করে না। হালামরা পূর্বজন্মে বিশ্বাস করে। এদের বিশ্বাস, যে নর বা নারী সুকর্ম করে গেছে ; মৃত্যুর সাত দিন পরই সে আবার জন্মগ্রহণ করে। এদের ধারণা, কোনো মানুষ মারা যাওয়ার পরই তার আত্মা চিল অথবা পায়রার রূপ গ্রহণ করে আবার ফিরে আসে।

হালাম এবং তাদের প্রতিবেশী অন্যান্য উপজাতিরা বিশ্বাস করে উঁচু-নিচু পাহাড়, গভীর উপত্যকা, জলাশয়, কবচ এবং বিশেষ বিশেষ গাছে উপদেবতা এবং দেবতারা বাস করেন। বন-জঙ্গল, শস্যক্ষেত্র, বাস্তুভূমি প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী আছেন। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা এই বিশ্বাসকে Fetishism বা জড়বাদ বলে অভিহিত করেন। হালামদের একটা অদ্ভুত ধরনের সংস্কার বর্তমান রয়েছে — তা হচ্ছে ৩০০ (তিনশত গ্রামের) গ্রামের ওজনের একজোড়া পাথর সন্তান উৎপাদনের বিশেষ সহায়ক বলে বিবেচিত হয় — এবং তাই ভক্তিভরে ঐ

একজোড়া পাথরকে জলভরা মাটির পাত্রে সযত্নে রক্ষিত হয়ে থাকে। এ জাতীয় সংস্কার অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও বর্তমান। জড়বাদে বিশ্বাসের এটাই হচ্ছে অন্যতম দৃষ্টান্ত।

প্রজনন বা উৎপাদিকা শক্তির পূজা হালামদের ধর্মীয় আচার-আচরণে বিশেষ স্থান লাভ করে আছে। ফসল-বৃদ্ধির জন্য হালামরা শস্যভাণ্ডারে বুধবার অথবা বৃহস্পতিবারে মুরগি এবং শূকর বলি দিয়ে থাকে। তাছাড়া সন্তান-ধারণক্ষম করানো এবং সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য 'আরকান থাও রবল' দেবতার পূজা করা হয়। একই উদ্দেশ্যে আবথাংনাই তুইয়ার, তুইফাংরাক এবং তুইখোয়াই দেবতাদের একটি একটি করে মুরগি বলি দেওয়া হয়। এই বলি দিতে হয় স্নানঘাটে, ভোরবেলায় ভাল দিনক্ষণ দেখে। মুরগির বলিতে উক্ত দেবতারা খুশি না হলে পাঁঠা বলি দেবার প্রথা রয়েছে। মা ও নবজাত শিশুর কল্যাণের জন্য মুরগি, শূকর বলি এবং ডিম নিবেদন করা হয় হাচুংনুগ দেবতার উদ্দেশ্যে। এখান বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, গরু ও গাভী পালনও ঐ সবের মঙ্গলের জন্য সমতলবাসী বাঙালিদের নিয়ম-নীতি হালাম কর্তৃক অনুসৃত হয়ে থাকে। হিন্দু বাঙালিদের মতো গৃহপালিত পশুদের কল্যাণার্থে ত্রিনাথ এবং সত্যনারায়ণ-পূজার বিধিও হালামদের মধ্যে প্রচলিত।

উপরে বর্ণিত পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়াও হালাম সমাজে বিশেষ দেব বা দেবীর উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে বার্ষিক পারিবারিক সর্বজনীন পূজাও পালিত হয়ে থাকে। হালামদের পূজিত কতিপয় দেবদেবীর নাম নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. আর্থুকনাই

হালামদের পূজিত আর্থুকনাই দেবতাযুগল করুণাময় — এঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কার্তিক ও গণেশ ঠাকুরের সমতুল আবার ত্রিপুরীদের যুগল দেবতা লাম্প্রা ও বিখিত্রার সমতুল। বিশেষ শুভতিথিতে এই দেবতাযুগলের পূজা দেওয়া হয়।

২. তুইমা

জলের দেবতা — যাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গঙ্গাদেবীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সুফলার জন্য এ পূজা দেবার বিধি প্রচলিত। এখানে উল্লেখ্য যে ; ত্রিপুরীদের পূজিত তুইমা বা গঙ্গা থেকে হালমাদের সমাজে অনুসৃত ও অনুকৃত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

৩. সেরিং আর্থা

শস্যদেবী। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের লক্ষ্মীদেবীর এবং ত্রিপুরীদের মাইলুংমার সমতুল।

৪. লাকুমফই

কার্পাসদেবতা। হালামদের এই দেবী ত্রিপুরীদের পূজিত খুলুমার সমতুল্য।

৫. পায়েংফা

হালামদের এই মঙ্গলময় দেবতা ত্রিপুরীদের বুড়াছার সমতুল।

৬. হাচুংমা

অনিষ্টকারী দেবী। ত্রিপুরীদের হাইচুকমা দেবীর সমতুল। হালামদের বিশ্বাস হাচুংমা বনে-জঙ্গলে বাস এবং পশুদের রোগের কারণ, এবং রোষবশে গৃহপালিত পশু এবং শিশুদের লুকিয়ে রাখে।

হালাম নৃত্য (হৈ-হক্-নৃত্য)

গান-বাজনার প্রবণতা প্রত্যেক উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। হালামদের মধ্যেও গান-বাজনা, নাচের প্রবণতা দেখা যায়। তবে হালামদের নাচ-গান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এদের নাচ-গান সাদা-মাটা গোছের। তাই রাজ্যের সাংস্কৃতিক জগতে এদের অবদান প্রায় শূন্যের কোঠায় — তবে জুম ফসল কাটার সময় হালামদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী মলসুমরা ধনের দেবী লক্ষ্মীপূজা করে থাকে। এই পূজা এদের ঐতিহ্যবাহী পূজা। ত্রিপুরী সমাজে যেমন ফসল পাকলে মাইলুংমা অর্থাৎ ধনের দেবীকে পূজা করা হয় — হালামরাও তেমনি লক্ষ্মীপূজা করে থাকে। তবে নিজেদের পদ্ধতিতে ওরা এ পূজা করে থাকে। এই পূজা উদ্‌যাপনের সময় দেবীকে সন্তুষ্ট করার মানসে মলসুমরা নারীপুরুষ দল বেঁধে গোলাকৃতি হয়ে বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গিমার মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশনকে আকর্ষণীয় করে তোলে। এই হৈ-হক্-নৃত্য হালামদের সর্বজনীন জাতীয় নৃত্য বলে পরিগণিত। হৈ-হক্-নৃত্যের বিচিত্র ছন্দ-তাল-লয়ে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে তাদের স্মরণাতীতকালের জাতিগত কৃষ্টির পরিচয়। সুতরাং হৈ-হক্-নৃত্য কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও রাজ্যের নৃত্য-কলার পরিমণ্ডলে এর সংযোজন অপরিহার্য।

লুসাইদের ধর্মীয় বিশ্বাস

সুরেন দেববর্মন

লুসাইদের ধর্মাচরণ

অন্যান্য অধিবাসীদের মতো লুসাইদের মূল ধর্মকে সর্বপ্রাণবাদ বা animism বলা হয়। সর্বপ্রাণবাদ বলতে বিভিন্ন অদৃশ্য শক্তির উপর বিশ্বাস। এই অদৃশ্য শক্তিই তাদের মনে উপকারী বা অপকারী দেবতা বা উপদেবতারূপে প্রভাব বিস্তার করে আছে। এই অদৃশ্য শক্তি তাদের মতে সর্বত্র বিরাজমান। লুসাইদের মতে 'পাথিয়ান' হচ্ছেন সর্বশক্তিমান দেবতা বা ঈশ্বর, যিনি একাধারে স্রষ্টা ও ত্রাণকর্তা। তবে লুসাইগণ সর্বশক্তিমান পাথিয়ানের ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল নয়। হুয়াই নামক অপদেবতা বা কাল্পনিক দানব লুসাইদের অন্তর-জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। কেননা এই দানব লুসাইদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করতে পারে যদি তাকে বলি প্রভৃতি উপচার দিয়ে সন্তুষ্ট না করা হয়। সুতরাং নারী বা পুরুষ বা ছেলেমেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই দানবের উদ্দেশ্যে পূজা ও বলি প্রদান করা হয়। লুসাই-জীবনে 'খউরিং' নামে আত্মার প্রভাবও কম নয় — এদের বিশ্বাস, এই আত্মা লুসাই রমণীদের ওপর ভর করে থাকে। এই আত্মা যে রমণীর ওপর ভর করে সেই রমণী যাবতীয় গোপন কথা খউরিং-এর গলার স্বরে প্রকাশ করে দেয়। খউরিং নামক আত্মাকে কোনো রমণীর দেহ থেকে বিতাড়ণের উপায়স্বরূপ লুসাই পুরোহিত চিৎকার, ঢাকঢোল পিটিয়ে বা বন্দুকের আওয়াজ করে থাকে।

লুসাইদের ধর্মবিশ্বাস ও বদ্ধ সংস্কার

লুসাইদের অন্তর্জবনে পরলোকের অস্তিত্ব বর্তমান। তারা বিশ্বাস করে মানুষের দেহ নশ্বর — কিন্তু আত্মা অমর — তাই মানুষের মৃত্যু হলেও তার আত্মার অস্তিত্ব পরলোকে বিরাজ করে। 'পিয়ালরাল হচ্ছে' লুসাইদের কল্পিত স্বর্গ — এই স্বর্গ পিয়াল নদীর তীরে অবস্থিত। এদের দৃঢ় বিশ্বাস, পিয়ালরাল হচ্ছে চিরন্তন স্বর্গীয় আশীর্বাদের স্থান-যারা এই স্বর্গীয় ভূমিতে পৌঁছোতে পারে তারা সুখাদ্য খেতে পায়। অপরক্ষের 'মিথিয়া খুয়া' বলে (মৃতদের গ্রাম) একটা রাজ্য বা মৃতপুরীর অস্তিত্বে তারা বিশ্বাস করে। সেই বাজ্যে যাদের ভাগ্য নির্ধারিত,

তাদের ভাগ্যে দুঃখ-কষ্টের অন্ত থাকে না।

লুসাইদের মতে যখন মানুষ নশ্বরদেহ ত্যাগ করে, তখন তার আত্মা মাথায় মুকুট পরিধান করে নশ্বরদেহ থেকে বেরিয়ে বার্মার চীন পাহাড়ের অর্ন্তগত রি-হ্রদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এই রি-হ্রদ মিজো পাহাড় সীমান্ত থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। তিন মাস অন্তে সেই আত্মা ফিরে এসে স্বগ্রামের কাছাকাছি জায়গায় বসবাস করতে শুরু করে। এই সময়ে মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গ বাড়িতে তার উদ্দেশ্যে একটি বসার জায়গা খালি রেখে আহার সাজিয়ে রেখে দেয়। তাদের বিশ্বাস, আত্মা তাদের সঙ্গে বসে আহারপর্ব সমাপন করে থাকে।

তিনমাস অতিক্রান্ত হবার পর মৃত ব্যক্তির পরিবার আত্মার বিদায়-পর্ব অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। লুসাইদের ভাষায় যাকে 'থিতিন আচার' বলা হয়। 'থিতিন' অনুষ্ঠান হয়ে গেলে পরিবার সেই আত্মাকে স্মরণ করে না — এবং আত্মাকে কল্পিত স্বর্গ 'পিয়ালরাল'-এ পৌঁছোবার জন্য দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয়।

পরিবর্তনের হাওয়া

কিন্তু পশ্চিম-দুনিয়ার খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে লুসাইদের আদিবাসী জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে। ইংরেজ ধর্ম ও কৃষ্টিকে গ্রহণ করার ফলশ্রুতি হিসাবে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লুসাইরা উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে লুসাইরা আদিম ধর্মের পরিবর্তে খ্রিস্টধর্মকে গ্রহণ করে যিশু খ্রিস্টকে আরাধ্য দেবতা হিসাবে পূজা করছে। ফলে লুসাইদের আদিম রীতিনীতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। খ্রিস্টধর্মে রূপান্তরিত লুসাই সমাজ আদিম পূজাপার্বণের পরিবর্তে গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা-সভায় যোগদান করছে। আজকের যুগে ডাক্তার, বাস্তুকার এবং প্রশাসনিক উচ্চপদের অধিকারী লুসাই যুবকদের দেখা যাচ্ছে।

লুসাই নৃত্য

সুরেন দেববর্মন

নৃত্য

লুসাইরা আমোদপ্রিয়। নৃত্য-সঙ্গীতের মাধ্যমে এরা জীবনকে উপভোগ করে। এদের জীবনবৃত্ত নৃত্য ও সঙ্গীতের সুরে সুরে গাঁথা।

লুসাইদের নৃত্যধারা বৈচিত্রময়। ভিন্ন ভিন্ন নৃত্যরীতির মধ্যে তাদের মনের ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। তাদের জনপ্রিয় নৃত্যরূপের মধ্যে চের, খউলাম, সোলাকিয়া, Rallulam, Pawnto-এর থাল্‌উগ্লাম নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চের নৃত্য/বাঁশ নৃত্য

চের বা বাঁশ নৃত্য লুসাইদের প্রসিদ্ধ লোকনৃত্য। কারুর অকাল মৃত্যু ঘটলে সেই মৃত ব্যক্তির আত্মাকে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করে তাদের কল্পিত স্বর্গের (পিয়ালরাল) দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবার জন্য এই নৃত্যের প্রয়োজন হয়। চের নৃত্য বা বাঁশ নৃত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে। — দুজন বা চারজন লোক দুই প্রান্তে মুখোমুখি বসে উভয় হাতে সমান লম্বা দুটো বাঁশ ধরে একবার বন্ধ একবার ফাঁক করতে থাকে। যখন বন্ধ করা হয় তখনই সুন্দর শব্দ তরঙ্গ ভেসে ওঠে — বারবার বন্ধ ও ফাঁক করার ফলে ছন্দ ও তাল ঝংকৃত হয়। সেই তালে তালে নৃত্যরত যুবক-যুবতীবৃন্দকে দুটো বাঁশের মাঝখানে একবার পা ফেলে একবার বার করতে হয়। বাঁশ দুটোকে যে মুহূর্তে ফাঁক করা হয় — সেই মুহূর্তে পা ফেলে দিয়ে বন্ধ করার পূর্ব মুহূর্তে পা বার করে দেবার যে কৌশল তা ছন্দের তালে তালেই সম্পন্ন হয় — এই নৃত্য অত্যন্ত উপভোগ্য। বংশদণ্ডের শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গে নৃত্যছন্দের চপলতা খুবই মনোরম দৃশ্য রচনা করে।

খুয়াল্লাম নৃত্য

খুয়াল্লাম নৃত্য পরিবেশিত হয় মূলত মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়। লুসাইদের বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতির জন্য সাতটি অনুষ্ঠান না করলে মৃত ব্যক্তি স্বর্গে পৌঁছোতে পারে না। খুয়াল্লাম নৃত্যে পাঁচটি মুদ্রা রয়েছে। যেমন: (১) নামথুয়াং অর্থাৎ সাধারণ পদক্ষেপ (২) ফেইখাই অর্থাৎ ছন্দের তালে পদ সঞ্চালন (৩) ভিক্‌ললেন অর্থাৎ আড়াআড়ি নৃত্য (৪) আরপুইচন্‌থাই অর্থাৎ

মুরগির আঁচড় (৫) সাইলিয়ান্নুকল অর্থাৎ হাতির হাঁটার অনুকরণ। এই পাঁচটি মুদ্রার নাচের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয। নানারকম সুরের সঙ্গে নাচের ভঙ্গিমাও মিলেমিশে থাকে।

সোলাকিয়া নৃত্য

এই নৃত্যও ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি মুদ্রায় পরিবেশিত হয়ে থাকে। মূলত এই নৃত্য বিজয়সূচক নৃত্য শিকারিদল বন্যা পশুপাখি শিকার করে বাড়ি ফিরলে বিজয় উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে সেলোকিয়া নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। মূলত এই নৃত্যে মিজো রাজ্যের দক্ষিণ অংশে বসবাসকারী 'পাইস' ও 'লেকাম' মিজো সম্প্রদায়ের লোকেরাই পরিবেশন করে থাকে। এই দুই স সম্প্রদায়কে বার্মাদেশ থেকে আগত বলে বলা হয়েছে। এই নৃত্যের বিশেষত্ব হচ্ছে নারী-পুরুষ উভয়ই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ডান পা-টিকে নাড়া দিয়ে বাঁ পা-টিকে ঝুঁকিয়ে তালে তালে হাঁটু গাড়ার ভঙ্গিমা করে। এই নৃত্যের সঙ্গে ঢাক ও ভেরি বাজানো হয়। বাজনার তালে তালে নাচে ছন্দ বেশ জমে ওঠে। বর্তমানে এই নৃত্য সারা মিজোরামে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পাশ্চাত্যের Locomotion নৃত্যের সাদৃশ্য থাকলেও সোলাকিয়া নৃত্য পুরোপুরি মিজোদের নিজস্ব নৃত্য-রীতি। কেননা সুদূর অতীতকাল থেকে এই নৃত্য মিজো সমাজে প্রচলিত।

পয়াস্তু নৃত্য

পয়াস্তু নৃত্যটি বাচ্চাদের। এরা গান-বাজনা ও খেলার ছলে এই নৃত্য পরিবেশন করে। পয়াস্তু নৃত্যের এখন সর্বজনীন প্রচলন নেই — ৭০ গ্রামের স্কুলের ছেলেমেয়েরা এই নৃত্য পরিবেশন করে থাকে।

ত্‌লাংলাম নৃত্য

এই নৃত্যটি লুসাই সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয়। 'ত্‌লাংলাম' শব্দের অর্থ জাতীয় নৃত্য বা গণনৃত্য। কথিত আছে, মিজোরামের বায়ানগিন গ্রামের একটি নাচের দল ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে এই নৃত্যের প্রচলন করে। লালঝিকা সাইলো নামে খ্রিস্টধর্মের একজন ঘোর বিরোধী ব্যক্তি এই নৃত্যের প্রবর্তক। কেউ কেউ মনে করে তাদের জীবনকে খ্রিস্টধর্মের প্রভাব থেকে দূরে রাখার জন্য এই নৃত্যের প্রবর্তন করা হয়েছিল। সে যাই হোক, আজকাল ত্‌লাংলাম নৃত্যের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে মিজোদের খুব জনপ্রিয় লোকনৃত্যের রূপ নিয়ে ত্‌লাংলাম নৃত্য মিজো সমাজে আদৃত হয়ে আছে।

উচইদের পূজাপার্বণ

সুরেন দেববর্মন

পূজা

ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া ও কলই প্রভৃতি উপজাতিদের সঙ্গে উচইদের পূজা-পার্বণ একই রকমের। এরা নানা দেবদেবীর পূজা-আরাধনা করে। উচইদের পূজিত দেবদেবীদের তালিকায় রয়েছে রনতক পূজা, কের পূজা, গঙ্গা পূজা, নকসুমতাই পূজা (গৃহদেবতা) ইত্যাদি।

রনতক পূজা

উচইদের রনতক পূজা হিন্দু বাঙালিদের লক্ষ্মীপূজা এবং ত্রিপুরীদের মাইলুংমা পূজার সমগোত্রীয়। জুমফসল তোলার পর নবান্ন উৎসবের সময় এই পূজার আয়োজন করা হয়। মাটির ঘট দিয়ে রনতক দেবীর প্রতীকী মূর্তি সাজানো হয়। একসঙ্গে দুটো ঘট ধুয়ে মুছে পিটুলি দিয়ে চিত্রিত করা হয়। অতঃপর জুমের কার্পাসজাত সুতো ও তুলোর মালা ঘটের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। দুটো ঘটেই নতুন ধানের চাল (আতপ) পূর্ণ করে সরা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। রনতক পূজার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এদের ব্যাখ্যা হচ্ছে, শস্যপূর্ণ ঘটের মতোই সারা বছর ধরে তাদের সংসারে অভাব থাকবে না — তাই এই পূজার আয়োজন অপরিহার্য। নববর্ষে ও লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিনেও রনতক পূজা পালিত হয়।

কের পূজা

ত্রিপুরী ও রিয়াং প্রভৃতি উপজাতিদের মতো উচই সমাজেও কের পূজা বারোয়ারি পূজা হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়। কের পূজার আয়োজন বছরে একবার হয়। এবং তা উচই সর্দার বা চৌধুরির বাড়িতেই সম্পন্ন করা হয়। কের পূজায় অত্যন্ত পবিত্রতা রক্ষা করতে হয়। কের পূজার জন্য নিষিদ্ধ এলাকা নির্ধারিত করা হয় — পূজার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কঠোর নিয়ম পালন করতে হয়। পূজার সময় নিষিদ্ধ এলাকার বাইরে বা ভিতরে যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে নিয়মভঙ্গ কারীকে সম্পূর্ণ খরচ দিয়ে পুনরায় পূজার ব্যবস্থা করতে হয়। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে পূজার যাবতীয় খরচ

চালানো হয়। পূজার সময় চৌধুরির বাড়িতে জন সমাবেশ হয়। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসেই উচইরা কের পূজা করে থাকে। বর্তমানে পূজার কঠোর নিয়মাবলী অনেক শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

গঙ্গা পূজা

এই পূজা উচইদের পারিবারিক পূজা। পরিবারের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে গঙ্গামায়ের কাছে প্রার্থনা জানাবার জন্য নদীর তীরবর্তী জায়গায় বাঁশের মন্দির তৈরি করে পূজা করা হয়। পুরাকালে পাঁঠা, শূকর ও মহিষ বলি দিয়ে গঙ্গা পূজা করা হত। বর্তমানে পশুবলি প্রায় উঠেই গেছে। তাই শুধুমাত্র চালকলা ও বাতাসা প্রভৃতি নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা করা হচ্ছে।

নকসু মতাই (গৃহদেবতা)

উচইদের বিশ্বাস, তাদের বাসগৃহে সাপের দেবী বাস করে। তাই এই দেবতাকে খুশি রাখতে হবে। সাপের দেবীকে পূজা করলে পরিবারের কল্যাণ হয়। তাছাড়া এই দেবীর আরাধনা করলে সর্পদংশন ও নানাবিধ রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। উচইদের কোনো দেবদেবীর মূর্তি নেই। ত্রিপুরী ও জমাতিয়াদের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য আছে। আজকাল উচইরা হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে। বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান উচইগণ নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে পূজা করে।

ধর্ম

উচইদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান এই কয়েকটি ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ রয়েছে। হিন্দু উচইদের মধ্যে অনেক বৈষ্ণবও আছে। বৌদ্ধ উচইদের মধ্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখা যায়। আগরতলার সুবিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরের বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রীঅক্ষ্মমানন্দ ভান্তে উচই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। উচইদের সংখ্যাধিক্য দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া বিভাগের রতনপুর, মুহুরিপুর, চরকপাই এবং অমরপুর বিভাগের সংখরাম উচইপাড়া, কেয়ই উচইপাড়া, পশ্চিম ডেপাছড়া, শান্তিনগর, রাঙাছড়া প্রভৃতি স্থানে পরিলক্ষিত হয়।

উচই সমাজে বহিঃসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ

বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এসে কোনা উপজাতিই আদিম জীবনধারায় গা ভাসিয়ে থাকতে পারে না। যে গিরিজন এই শতাব্দীর প্রথম পাদে নিছক অরণ্য-জীবনধারায় মগ্ন থেকেছে, তার পারিপার্শ্বিকতা আধুনিক জীবনের দমকা হাওয়ার

ধাক্কা সামলে নিতে গিয়ে তার আদিমতার নেশাভঙ্গ হয়ে গেল। এই যে সংঘাত, এটা বিরোধের নয় — এটা তার জীবনের আশীর্বাদ। তাই উচইদের জীবনের প্রতি পদে পরিবর্তনের স্রোত এসেছে — শিক্ষার আলো তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন মনের জগতে আলোক বিকীর্ণ করছে। সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম-আচরণে, বেশভূষায় আধুনিকতার ছাপ হয়ে উঠেছে স্পষ্টতর। এভাবে তারা জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে মিশে যেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।

ত্রিপুরার আদিবাসীদের পূজিত দেবদেবী

জগদীশ গণচৌধুরী

চৌদ্দ দেবতা

ত্রিপুরার রাজপরিবারের কুল দেবতা হলেন চৌদ্দ জন দেব-দেবী। এই ১৪জন দেব-দেবীর নাম হল - হর, উমা, হরি, মা, বাণী, কুমার, গনপা, বিধি, ক্ষ্মা, অব্ধি, গঙ্গা, শিখী, কাম, হিমাদ্রি। অর্থাৎ শিব, দুর্গা, হরি, লক্ষ্মী, রাগদেবী, কার্তিকেয়, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব এবং হিমাদ্রি।

এই ১৪ জন দেব-দেবী ত্রিপুরাতে দীর্ঘকাল ধরে রাজকীয় ব্যবস্থাপনায় পূজিত। ত্রিপুরার প্রাচীন নরপতি মহারাজ ত্রিলোচন এই পূজার প্রবর্তন করেন। শত-শত বছর ধরে সেই পূজা-অর্চনা অব্যাহত হয়েছে। বহু ঐতিহাসিক উত্থান-পতন সত্ত্বেও এই ১৪জন দেব-দেবীর পূজা বিঘ্নিত হলেও পরিত্যক্ত হয় নি। রাজকীয় ব্যবস্থাপনায় মন্দির নির্মিত হয়েছে, পুরোহিত নিযুক্ত হয়েছে। সমসের গাজির আক্রমণে মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য (১৭৪৮-১৭৮৩ খ্রিঃ) উদয়পুর থেকে আগরতলায় রাজধানী সরিয়ে আনেন ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে। সেই ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে থেকে অদ্য অবধি পুরাতন আগরতলাতে ১৪ দেবতার মন্দির বিরাজিত।

১৪ দেবতার মন্দিরের প্রাঙ্গণ বিশাল; পুরোহিতের পদবি, সংখ্যা, দায়-দায়িত্ব নানা রকম। প্রধান পুরোহিতকে বলা হয় চন্তাই মহারাজ। মোট ৬৪ জন সেবক-পূজক নিযুক্ত আছেন ঐ মন্দিরে।

প্রতিদিন পূজা হয়, চণ্ডী পাঠ হয়, পাঁঠা বলিদান হয়। তবে আষাঢ় মাসে শুক্লা-অষ্টমী তিথিতে পূজা শুরু হয়ে সপ্তাহব্যাপী চলে। এই বিশেষ পূজার নাম খার্চি পূজা। চৌদ্দ দেবতার পূজার প্রবর্তক মহারাজ ত্রিলোচন ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, জাতীয় সংহতি-বিধায়ক প্রজারঞ্জক নরপতি। শত শত বছর ধরে অব্যাহত সুমহান ঐতিহ্যপূর্ণ খার্চিপূজায় অংশ নেয় নানা বর্ণের ও বংশের লোকজন।

পরমেশ্বর বাবা গড়িয়া

যাবতীয় মাঙ্গলিক কাজে, বিশেষত বিবাহে গড়িয়া নামক দেবতার পূজা দেওয়া হয়। গড়িয়া দেবতার পূজা বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত

হয় বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনায়।

ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্র বসবাসকারী দেববর্মা, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং, খাকলু, কলই, উচই প্রভৃতি সম্প্রদায় গড়িয়া দেবতাকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করে। গড়িয়া দেবতার ব্রতকথা আছে। কৃষ্ণধন জমাতিয়া নামক জনৈক শিক্ষিত ভক্ত গড়িয়া দেবতার উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করেছেন। কাহিনীর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ —

লক্‌তায় ও হাচুক্‌তি নামক এক দম্পতি বাস করতেন সুদূর প্রাচীন কালে। তাঁরা ছিলেন জুমচাষি, পর্বতবাসী, সৎ, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, দয়ালু ও পরোপকারী। প্রথম জীবনে তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান। তাই পাড়া পড়শির পরামর্শে তাঁরা এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন এবং ছেলেটিকে খুব আদর-যত্ন করে লালন-পালন করেন। কিন্তু দত্তক গ্রহণ করার তিন বছর পরেই ছেলেটি মারা যায়।

লকতায় ও হাচুকতি গভীর শোকে মুহ্যমান। খাওয়া দাওয়া, কাজ-কর্ম বন্ধ। স্বামী-স্ত্রী কেবল কান্না-কাটি করতে থাকেন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টার কাছে কেবলই পুত্র কামনা করেন। সাত বছর তপস্যার পর ব্রহ্মার করুণা হল। স্বপ্নাদেশ হল - ব্রহ্মা নিজেই পুত্ররূপে আসবেন, এবং আরো ৩ বছর পরে যথাসময়ে আরো দু'টি যমজ কন্যা জন্ম নেবে।

দৈববাণী সত্য হল শুভদিনে শুভক্ষণে এক সুন্দর শিশু জন্ম নিল। পরে দু' কন্যাও। এই দেবপুত্র হলেন গড়িয়া এবং দেবকন্যা হলেন মাইলুংতি ও খুলুংতি। দম্পতির আনন্দের আর সীমা রইল না।

কিন্তু দেখা দিল এক সম্যাসা। নবজাতকের মেরুদণ্ড অস্বাভাবিক শক্ত। মেরুদণ্ড নমনীয় হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় নানা রকম কষ্ট, অসুবিধা হবেই। মেরুদণ্ড শক্ত হওয়ার জন্য কেউ কেউ এই শিশুকে ডাকত 'সিয়ং কৌরাক' বলে। যাতে তার মেরুদণ্ড নরম, নমনীয় হয়, সেজন্য মা-বাবা ডাকতেন নরসিঁয়ং বলে।

এই নরিসিঁয়ং কালক্রমে নরসিংহ তথা নৃসিংহ অবতার রূপে পরিচিত হন। তিনি ভক্ত প্রহ্লাদের রক্ষা কর্তা এবং দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নামক হরিবিদ্বেষীকে বধ করেন। মা-বাবার ইচ্ছা যুবক পুত্রকে বিবাহ করানো। নরসিংহ নারাজ। কিছুতেই তিনি এপথে যাবেন না। মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হবেন না। তাঁর প্রকৃত স্বরূপ না জানায়, চারিদিক থেকে চাপ আসতে লাগল উদ্বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য। এমন সুন্দর, সুপুরুষ, সৎ, সাহসী, নির্লোভ, পুরোপকারী যুবকের

হাতে কন্যা দিতে বহু বাবা-মা আগ্রহী। অবশেষে প্রায় জোর-জবরদস্তি করে বিয়ে দেওয়া হল। বছর খানেকের মধ্যেই বেজে ওঠে বিচ্ছেদের করুণ সুর। অভিযোগ এল নববধূর কাছ থেকে।

প্রথম বিবাহ ভেঙে গেল। দ্বিতীয় বার অপেক্ষাকৃত সুন্দরী মেয়ে এনে বিবাহ দেওয়া হল। দ্বিতীয় বউ কিছু দিন পর একই অভিযোগ এনে বিচ্ছেদ করে চলে যায়। আবার বিবাহ। আবার বিচ্ছেদ। এভাবে ছয় বার। বউদের নাম হল যথাক্রমে আফুতি, নাফুতি, কুফুতি, কুচাংতি ও কর্মতি। বউদের সাথে মিল-মিশ, প্রীতি-প্রেম হয় না, তাই নরসিংহকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে বন্ধু-বান্ধব, সমবয়সীরা ডাকত 'গরয়া'। 'গরয়া' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল গড়মিল।

অবশেষে শেষ চেষ্টা। সপ্তম বিবাহ। গড়িয়ার দেহ-মনে যাতে কাম ভাব জেগে উঠে সেজন্য সমবয়সীরা যৌন ভবোদ্দীপক নানা রকম হাসি, ঠাট্টা, তামাশা, গল্প, নাচ, গান এর আয়োজন করল। এই সপ্তম বিবাহ উৎসহ হল সুপরিকল্পিত, সুব্যবস্থিত ও দীর্ঘ ৭দিন ৭রাত ব্যাপী। এই কয়দিন সমগ্র পাড়া পড়শি উৎসবের আনন্দে মেতে উঠল। চলল জীবন ও যৌবনের জয়গান।

এই মহান উৎসব শুরু হয়েছিল বিষুব সংক্রান্তিতে অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে, শেষ হল ৬ই বৈশাখ সন্ধ্যায়। এই কয়দিন স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ সকলেই সব ভুলে গিয়ে আনন্দে হল মাতোয়ারা।

কিন্তু সকলকেই অবাক্ করে দিয়ে পরদিন প্রভাতে গড়িয়া বলে বসলেন, সন্ন্যাস নেবেন পরিব্রাজক হবেন, গ্রাম ছাড়বেন। তীর্থ পর্যটন যাবেন। যেমন কথা, তেমন কাজ। পরিবারের ও পাড়ার সকলেই প্রিয়জনের বিদায় লগ্নে শোকে-দুঃখে মুহ্যমান। কিন্তু গড়িয়া সিদ্ধান্তে অটল, অবিচল।

বিদায় লগ্নে গড়িয়া কিছু দায়িত্ব ও আশীর্ব্বাদ দিয়ে গেলেন স্ত্রী ও বোনকে। স্ত্রী কাঁচাংতি হলেন জলের অধিষ্টাত্রী দেবী তুই বুকমা ; বোন মায়লাংতি হলেন ধানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মাইলুমা ; অন্য বোন খুল্‌লোংতি কার্পাসের অধিষ্টাত্রী দেবী খুলুমা।

গড়িয়ার অতীব অন্তরঙ্গ সখা হলেন তক্‌চাক্-ফা। বন্ধু সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তাই বাধ্য হয়ে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন পরমেশ্বর গড়িয়া। আর বলে গেলেন কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ। যেমন —

(১) কের-এর অর্থ হল - কায়-মন-বাক্যের শুচিতা দম-যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার। (২) কীথার ঃ- আত্ম সমর্পণ, পবিত্রতা, আসন, ধ্যান ও ধারণ।

(৩) কীবীয় ঃ- কীবীয়-এর অর্থ হল সত্য। পরম ব্রহ্মাই হল চিরন্তন সত্য। সিদ্ধিলাভ। মোক্ষলাভ।

শিবরাই ও তাওচিঙ চৌঙমা ; দেবলক্ষ্মী ও দেবতারিণী

দেবাদিদেব হলেন শিবরাই ; তাঁর স্ত্রী হলেন তাওচিঙ চৌঙমা ; কন্যাদ্বয় হলেন দেবলক্ষ্মী ও দেবতারিণী। তাঁরা হলেন শিব ও দুর্গার নামান্তর। দেবলক্ষ্মী ও দেবতারিণী হলেন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর নামান্তর।

ত্রিপুরার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী রিয়াং সম্প্রদায় শিবরাই, তাওচিঙ চৌঙমা, দেবলক্ষ্মী ও দেবতারিণী নামক দেব-দেবীকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। দেববর্মা সম্প্রদায়-এর মতাই কতরও মতাই কতরমা, এবং রিয়াং সম্প্রদায় এর শিবরাই ও তাওচিঙ চৌঙমা সমার্থবোধক।

শিবরাই হলেন আশুতোষ, মঙ্গলময়, করুণাময়, ভোলানাথ। সমস্ত জীবজগৎ তাঁর আশ্রিত। তাঁর অসীম ক্ষমতা। তিনি ভক্তদের পিতৃতুল্য। তিনি সমদর্শী, সহিষ্ণু। ভক্তদের গৃহে-গৃহে, তার নিত্য পূজা পরিলক্ষিত হয় না। গৃহ কোণে আসন, প্রতীক, মূর্তি খুব কম দেখা যায়। কিন্তু বার্ষিক বারোয়ারি পূজায় তিনি সপরিবারে অবশ্যই পূজিত হন। এজন্য চারটি পাঁঠা বলিদান করতে হয়।

মতাই কতর ও মতাই কতরমা

সমস্ত দেব-দেবীর মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ও সর্বোপরি তিনি হলেন মতাই কতর। তাঁর স্ত্রীর নাম মতাই কতরমা। মতাই কতর ও মতাই কতরমা হলেন শিব ও দুর্গার নামান্তর।

ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্র বসবাসকারী দেববর্মা, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং, কলই, খাকলু, উচই প্রভৃতি সম্প্রদায় মতাই কতর ও মতাই কতরমা নামক দেবতা যুগলকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। সম্প্রদায়-ভেদে নামকরণে সামান্য পার্থক্য থাকতে পারে।

এই দেবতা-যুগল স্বভাবে শান্ত পরম দয়ালু, পরম সহিষ্ণু, ক্ষমতাশীল ও আশুতোষ। সমস্ত দেবতাদের অভিভাবক স্বরূপ হলেন মতাই কতর। তিনি নিত্য

পূজিত হন না ; বাড়িতে গৃহকোণে তাঁর কোন স্থান ও আসন সচরাচর দেখা যায় না। তবু তিনি ভক্তদের কাছ থেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি পান। বার্ষিক বারোয়ারি পূজায় তিনি বলিদান পান। এই দম্পতির জন্য এক জোড়া পাঁঠা বলিদান করতে হয়।

সাত বোন

নানা রকম রোগের উপদ্রব থেকে পরিত্রাণ পেতে সাতবোনকে পূজা করে রিয়াং সম্প্রদায়। সাতবোন-এর নাম হল আলুতাই কন্যামা, আশুতাই কন্যামা, লুংলিতাই কন্যামা, চুংলিতাই কন্যামা, বুকলি কন্যামা, কুকলি কন্যামা, আবস্যা কন্যামা।

ত্রিপুরার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী রিয়াং সম্প্রদায়-এর মধ্যে এই সাত জন দেবীর পূজা প্রচলিত। এই সাতজন দেবী হলেন স্বভাবে বড়ই খল ও চঞ্চল প্রকৃতির অপদেবতা। তাঁরা ইতঃস্তত ঘুড়ে বেড়ায়। সুযোগ পেলেই, অসাবধান লোককে কষ্ট দেয়, কারো পেট ব্যথা, কারো মাথা ব্যথা, কারো বমি, কারো অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ লাগিয়ে দেয়।

এই সাত জন অপদেবতা নিত্য পূজিতা হন না। ঘরের ভেতর তাঁদের রাখা যায় না। এঁরা যত দূরে থাকে ততই মঙ্গল। দূর থেকে প্রণাম জানানোই নিরাপদ। কিন্তু বছরে একবার অন্তত বলিদান দিয়ে পূজা না দিলে খেপে যেতে পারে। তাই পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এই চার মাসের মধ্যে অনুষ্ঠেয় কের পূজাতে এই সাত বোন পূজা পান। মাথাপিছু একটি করে ছোট মোরগ বলিদান করতে হয়। এছাড়াও কারো কোন রোগ শোক হলে ওঝার পরামর্শ মতো পূজা দিতে হয় সাত-দেবীকে।

সাত বোন

রোগ-শোক, আপদ-বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে সাতবোন ও তাঁদের স্বামীকে পূজা করে খাকলু সম্প্রদায়। এই সাতবোনকে এককথায় বলে বুকু সিনি। এঁদের নাম হল উংমা, উংসা, থুংমা, থুংসা, ফুংমা, ফুংসা, মুংমহাগিরি। তাঁদের স্বামীর নাম হল লাইরেং।

ত্রিপুরার দক্ষিণ প্রান্তে বিলোনীয়া মহকুমার অন্তত তুলসী পাহাড়ে খাকলু - নামক পুরাণ ত্রিপুরী উপসম্প্রদায় বাস করে। বিলোনীয়া নগর থেকে ঋষ্যমুখ-

গামী রাস্তার পূর্ব পাশে, মতাই, বটকৃষ্ণ বাড়ি, গৌড়া ছড়া প্রভৃতি পর্বতে পল্লিতে খাকলু সম্প্রদায় বাস করে। আনুমানিক ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ কলহে রাজা জয়মাণিক্য ক্ষমতাচ্যুত হন এবং কিছু সংখ্যক অনুচর নিয়ে মতাই নামক স্থানে আশ্রয় নেন। রাজা জয়মাণিক্য ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। জয়মাণিক্য -এর সহগামীরা মতাই, ঋষ্যমুখ প্রভৃতি স্থানে রয়ে যায়। তারাই হল খাকলু সম্প্রদায়ভুক্ত পুরাণ ত্রিপুরী।

এই সাতবোন হল খল স্বভাবের অপদেবতা। সুযোগ পেলেই রোগ-শোক বাঁধিয়ে দেয়। তাই বছরে অন্তত একবার পূজা দিতে হয়। সাড়া গ্রামের লোকেরা চাঁদা সংগ্রহ করে পূজার আয়োজন করে। পূজার সময় হল শীতকাল, গ্রীষ্মকাল। পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই চারমাসের মধ্যে পূজা দিতে হয়। এই চার মাসের মধ্যে সময়-সুযোগ করে, আলাপ-আলোচনা করে, চাঁদা তুলে, সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করে পূজা দেয়। পাড়ার গাঁও প্রধান হল চৌধুরি। চৌধুরি মহাশয় উদ্যোগ নেন। বার্ষিক কের পূজার সময় এই উদোগ নেওয়া হয়।

পূজার জন্য ফুল, দুর্বা ইত্যাদি তো লাগেই, অধিকন্তু এই আট জনের জন্য একটি করে মোট আটটি ছোট মোরগ বলিদান করতে হয়।

যমদূত

মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন যমরাজ যমরাজার রাজত্বে সিপাহী, সৈন্য, রাজদূত ইত্যাদি রয়েছে। কালাতর ও বিলাতর, যমদূতপাল ও দুদুপাল, রদমখা ও বিদমখা হলেন যমরাজার সৈন্যসামন্ত। মৃত ব্যক্তির আত্মাকে যমরাজার কাছে নিয়ে যাওয়া, বিচারে হাজির করা, বিচার অনুসারে শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করা তাদের কাজ।

ত্রিপুরার পার্বত্য পল্লিতে বনবাসী সমাজে এই সব যমদূতরা কোন বিশেষ উপলক্ষে পূজা পান। তারা খলদেবতা। নিত্য পূজা পান না। বছরে একবার বার্ষিক পূজাতে অসংখ্য দেব-দেবী পূজা পান। তাঁদের উদ্দেশ্যে পশু-পাখি বলিদান করা হয়। ফুল, দুর্বা দেওয়া হয়। মদ দেওয়া হয়।

কালা বাবু

পাহাড় পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কালাবাবু পূজিত হন যাতে জুম চাষের সুবিধা হয়।

ত্রিপুরার হালাম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মলসম (মরছুম) জনগোষ্ঠী কালাবাবু নামক দেবতাকে ভক্তি করে বনদেবতা পায়েংপা ও পর্বতদেবতা কালাবাবু সমার্থ বোধক নয়। ঠিক তেমনি বনদেবতা বুড়াছা এবং পর্বত দেবতা কালাবাবু সমার্থবোধক নয়। বুড়াছা ও পায়েংপা সমার্থবোধক। উভয়েই খল। কিন্তু কালাবাবু খল নন। কালাবাবু হলেন মঙ্গলময় দেবতা।

কালাবাবু স্বভাবে ধীর-স্থির, মঙ্গলকারী। সমস্ত পাহাড়-পর্বত তাঁর আওতাভুক্ত। কিন্তু বন জঙ্গল, বন্য পশু-পাখি তাঁর আশ্রিত প্রজা নয়। হালামদের মতে পায়েংপা এবং দেববর্মা-নোয়াতিয়া জমাতিয়া-রিয়াংদের মতে বুড়াছা হলেন বনের গাছপালার বন্য জীবজন্তুর আশ্রয়দাতা। কালাবাবু নিত্য পূজা পান না। ভক্তের গৃহে তাঁর জন্য আসন নেই। বছরে একবার বারোয়ারি পূজায় তিনি একটি মোরগ শাবক বলিদান পান।

গাজি কালু

বাঘ ও শূকর এর উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে গাজি কালু নামক অপদেবতার পূজা হয়।

ত্রিপুরার দক্ষিণ প্রান্তে বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ি ও ঋষ্যমুখ নামক বড় জনপদের মধ্যবর্তী তুলসী পর্বতে বাস করে খাকলু নামক জনগোষ্ঠী। তারা পুরাণ ত্রিপুরী নামেও পরিচিত। এই খাকলু সমাজে গাজি কালু নামক ব্যাঘ্রদেকে ভয়-ভক্তি করে। খাকলুরা মনে করে, গাজি কালু হল মুসলমান সমাজের কাল্পনিক পীর-ফকির-জিন জাতীয় কেউ। সেই লৌকিক বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, খাকলু সমাজে গাজি কালুর পূজা প্রচালিত হয়েছে। ভিন্ন জাতীয় সমাজ থেকে আগত বলে, গাজি কালুকে কের পূজার সময় পূজা দেয় না।

জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে পাড়া-পড়শিরা সুযোগ-সুবিধা অনুসারে চাঁদা তুলে শনি কিংবা মঙ্গল বারে গাজি কালুর পূজার আয়োজন করা হয়। এর জন্য একটি পাঁঠা বলিদান দিতে হয়। পূজার পুরোহিত হল খাকলু সমাজেরই অচাই। পূজার সময় অচাই ধুতিকে লুঙ্গির মত পরিধান করে। ভক্তদের বিশ্বাস এই খল দেবতাকে বৎসরে অন্তত একটি পাঁঠা না দিলে, সারা পাড়ার গৃহপালিত পশু পাখি ধ্বংস করে দেবে। এর চাইতে বরং একটি পাঁঠা দিলে অনেক কম ক্ষয়-ক্ষতি হয়।

তুই বুমা, কাংসরী, নাকড়ী ও তুইস্কাও ইয়ক্‌মা

জীবজগতের ও যাবতীয় কাজের অত্যাবশ্যক উপাদান হল জল। জলের ধারা অব্যাহত রাখতে, সময় মত, ঋতু অনুয়ায়ী বৃষ্টি পেতে, বিশুদ্ধ পানীয় জল

পেতে জল দেবী তুই বুমা ও তাঁর সহচর-সহচারীরা পূজা পান। তুই বুমা হলেন গঙ্গাদেবীর নামান্তর।

ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্র বসবাসকারী দেববর্মা, রিয়াং, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, খাকলু, উচই, কলই প্রভৃতি সম্প্রদায় এই জলদেবীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। সম্প্রদায় ভেদে, অঞ্চল ভেদে জলদেবীর নামের উচ্চারণে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন রিয়াং সম্প্রদায় বলে তুই বুমা, দেববর্মন সম্প্রদায় বলে তুইমা, নোয়াতিয়ারা বলে তুইমা, কেউ কেউ বলে তুই বুকমা, মরছুম সম্প্রদায় বলে তুই বুখা, তুই পাথ, তুই খারিনু। মরছুম সম্প্রদায়ের মতে ছোট নদী বা উপনদীর দেবতা হলেন তুই বুখা, বড় নদীর দেতো হলেন তুই খারিনু, এবং সমগ্র জলের দেবতা হলেন তুই পাথন। রিয়াং সম্প্রদায়ের মতে জলদেবী তুই বুমা এর তিন জন সহচর-সহচরী আছেন, তাদের নাম হল কাংসরী, নাকড়ী ও তুইস্কা ও ইয়কমা।

জলের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীরা প্রতিদিন পূজা পান না ; বাড়িতে, গৃহকোণে তাঁদের জন্য কোন আসন নির্দিষ্ট থাকে না। কিন্তু তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে। পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এই চার মাসের মধ্যে সময়-সুযোগ করে চাঁদা তুলে বারোয়ারি কের পূজা আয়োজিত হয়। সেই কের পূজাতে জলের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীরা অন্যান্য দেব-দেবীর সাথে পূজা পান।

তুই পাথন, তুই খারিনু, তুই বুখা

পর্যাপ্ত পরিমানে জল পেতে, বিশুদ্ধ পানীয় জল পেতে, সময় মত বৃষ্টি পেতে, কৃষিকাজে জল পেতে পূজা দেওয়া হয় তিন জলদেবীকে। এঁদের নাম হল তুই পাথন, তুই খারিনু, তুই বুখা। তুই পাথন হলেন সমগ্র জলের দেবতা ; তুই খরিনু হলেন বড় বড় নদীর দেবী ; তুই বুখা হলেন ছোট ছোট-নদী-নালা-ছড়ার দেবতা। এই তিন দেবতার মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক আছে। যেমন তুই পাথন হলেন পিতা, তুই খারিনু হলেন মাতা, তুই বুখা হলেন পুত্র।

ত্রিপুরায় বসবাসকারী হালাম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মলসম (মরছুম) সম্প্রদায় এই তিনজন দেবতাকে পূজা দেয়। বাসগৃহে এই তিন দেবতার কোন আসন নেই, মূর্তি নেই। অনাবৃষ্টি, কম বৃষ্টি, খরা হলে এই তিন দেবতার পূজা দিতে হয়। নতুন পাড়া নির্বাচন করতে গেলে এই তিন দেবতা পূজা পান। তাঁরা নিত্য পূজা পান না। কিন্তু শীতকালে ও বসন্তকালে বার্ষিক বারোয়ারি পূজায় তাঁরা পূজিত হন। বলিদান আবশ্যক।

থুমনাইরাও মতাই, সুইনাইরাও মতাই, বনিরাও মতাই

মৃত্যুর খবরদাতা হলেন বণিরাও, মৃতব্যক্তির পাপ-পূণ্যের হিসাব রক্ষক হলেন সুইনাইরাও এবং মৃতের পাপ-পূণ্যের বিচারক হলেন থুমনাইরাও। সুতরাং থুমনাইরাও মতাই হলেন যমরাজ। সুইনাইরাও মতাই হলেন চিত্রগুপ্ত এবং বনিরাও মতাই হলেন যমদূত।

ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্রই বসবাসকারী দেববর্মা, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং, খাকলু উচাই, কলই, প্রভৃতি স ম্প্রদায়সমূহ থুমনাইরাও মতাই, সুইনাইরাও মতাই, ও বনিরাও মতাই নামক এই ত্রয়ীকে ভয় ও ভক্তি করে।

এই তিন দেবতা সারা বছর পূজিত হন না ; নিত্য পূজা দেওয়া হয় না। ঘরের অভ্যন্তরে তাঁদের কোন আসন ও প্রতীক রাখা হয় না। বুড়াছার মত ভয়াবহ খল স্বভাব এঁদের নেই। এঁরা লোভী নন, বদমেজাজি নন। এঁরা নির্লোভ, নিরপেক্ষ। যার যখন সময় হবে পরপারে যাবার, তখন নিস্তার নাই এঁদের হাত থেকে। রাজা, প্রজা, ধনী-দরিদ্র বর্ণ বংশ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এঁদের শাসনাধীন। পাপ-পুণ্যের বিচারে কাউকে খাতির করেন না তাঁরা। তাঁদের বিচারের পরই, পরবর্তী জন্ম কোথায় হবে ঠিক হয়।

পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এই চার মাসের মধ্যে সময়-সুযোগ অনুসারে প্রতিটি পাড়ার অধিবাসীরা গ্রামের চৌধুরির উদ্যোগে সমবেত প্রচেষ্টায় ও খরচে সব দেবদেবীর পূজা দেয়। যা কের নামে পরিচিত। এই বারোয়ারি পূজায় এই তিন দেবতা পূজা পান। প্রত্যেকে একটি করে মোরগ শাবক বলিদান পান।

ধনসদাগরমা, সাংরংমা, ধলেশ্বরী মা

ধন-সম্পত্তি রক্ষাকল্পে পূজিতা হন ধনসদাগরমা ও সাংরংমা। গৃহপালিত মহিষ ও গাভীর দুধ যাতে বেশী পাওয়া যায় সেজন্য পূজিতা হন ধলেশ্বরীমা।

ত্রিপুরার হালাম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মলসম (মরছুম) জনগোষ্ঠী ধনসদাগরমা, সাংরংমা ও ধলেশ্বরীমাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। সাংরংমা পূজিতা হন দেববর্মা, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং, উচই, খাকলু, হালাম প্রভৃতি বৃহৎ সম্প্রদায় কর্তৃক। সাংরংমা খুবই পরিচিতা দেবী। সাংরংমা-এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিতা হলেন ধনসদাগরমা ও ধলেশ্বরীমা। দুগ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে ধলেশ্বরী দেবী বাঙালি হিন্দু সমাজেও পরিচিত।

এই তিন দেবী মৃদু-মধুর স্বভাবের, শান্ত প্রকৃতির, মঙ্গলকারী দেবতা। তাঁদের কোন নির্দিষ্ট আস্তানা ও আসন নেই। মঙ্গয়লময় হলেও গৃহকোণে নিত্যপূজার ব্যবস্থা নেই। শুধু বছরে একবার অন্তত পূজা দেওয়া হয়। পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র — এই চার মাসের মধ্যে সময়-সুযোগ করে পাড়ার সব পরিবার মিলে বারোয়ারি পূজার ব্যবস্থা করা হয়। তখন এই তিন দেবী পূজা পান। পূজায় তিনটি মোরগ শাবক বলিদান করা হয়।

নকছু মতাই

ঘর-বাড়ি রক্ষাকল্পে পূজিত হন নকছু মতাই নামক দেবতা। তিনি হলেন বাস্তু ঠাকুর। ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্র বসবাসকারী দেববর্মা, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং, উচাই, খাকলু, কলই প্রভৃতি সম্প্রদায় গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পূজা দেয়। ঝড়-তুফানে, আগুনে, বন্য হিংস্র পশুতে, অবদেবতায় গৃহের ক্ষতি করতে পারে। এই আশঙ্কায় নকছু মতাই অবশ্যই পূজনীয়।

নিঃসন্দেহে নকছু মতাই হলেন মাঙ্গলিক দেবতা। এই দেবতার একটি প্রতীক ঘরের অগ্নিকোণে রাখা হয়। বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি একটি ক্ষুদ্র, চৌকোণ ঝাঁজার মন্ত্রপূত করে ঘরের চাল এর মধ্যে গুঁজে দিতে হয়। এটি নকছু মতাই-এর মূর্তি নয়, প্রতীক মাত্র। এই দেবতা নিত্য পূজিত হন না। নতুন ঘর-বাড়ি বানাতে হলে, তাঁর পূজা অত্যাবশ্যক। গৃহপ্রবেশের সময় তাঁর পূজা দিতে হয়। এছাড়া, বার্ষিক বারোয়ারি পূজাতে অর্থাৎ কের নামক বিশাল পূজাতে এই দেবতা পূজা পান। বলিদান হল নৈবেদ্যের অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

পায়েংফা, থিংকুংনই, আইপাংনই

সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার নিমিত্ত বন-জঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থিংকুংনই এবং দুর্ঘটনার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আইপাংনই পূজিত হন।

ত্রিপুরার হালাম নামক বৃহৎ জনজাতির অন্তর্গত মলসম বা মরছুম নামক গোষ্ঠী যেসব খল প্রকৃতির দেব-দেবীকে ভয়ও শ্রদ্ধা করে, তাঁদের মধ্যে এই তিন দেবতা প্রধান। ত্রিপুরার অধিবাসীদের মধ্যে বনদেবতা বিভিন্ন নাম পূজিত হন। যেমন — দেববর্মা, নোয়াতিয়া ও জমাতিয়া সম্প্রদায় বনদেবতাকে বলে বুড়াছা, রিয়াং সম্প্রদায় বনদেবতাকে বলে বুড়াহা, হালাম সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ কেউ বন দেবতাকে বলে পাওয়েংফা।

পাওয়েংফা, থিংকুংনই ও আইপাংনই হলেন খল প্রকৃতি, বদমেজাজি, চঞ্চল, প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবতা। তাঁরা নিত্য পূজিত হন না। গৃহকোণে পবিত্র আসনে এঁদের কোন প্রতিকৃতি বা মূর্তি রাখা হয় না। ভক্তরা ভয়বশত ভক্তি করে। ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবশতঃ আরাধনা করে না। আবার ক্ষিপ্ত হলে, রুষ্ট হলে বিপদ। তাই বছরে অন্তত একবার পূজা দিতে হয়। পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এই চার মাসের মধ্যে সময়-সুযোগ করে পাড়া পড়শিরা সমবেত উদ্যোগে ও খরচে পূজা দেয় সব দেবদেবীকে। তখন তাঁরাও পূজা পান। এছাড়া, কোন ব্যক্তি যদি বিপদে পড়ে, রোগগ্রস্ত হয়, দুর্ঘটনায় আহত হয়, তখন পারিবারিক উদ্যোগে ছোট করে পূজা দেওয়া হয়। বলি দিতে হয়। মাথাপিছু একটি করে মোরগ শাবক বলিদান করা হয়।

বুড়াছা ও হাইচুকমা, যম্‌পিরা ও কাল্‌পিরা

ভয়ে ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হলে, তার থেকে মানসিক স্বাভাবিকতা ও সুস্থতা ফিরে পেতে, শিকারে সাফল্য লাভের জন্য এবং গৃহপালিত পশু-পাখি হারানো গেলে, ফিরে পেতে বুড়াছা নামক দেবতার পূজার প্রচলন আছে।

ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্র বসবাসকারী দেববর্মা, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং, খাকলু, উচাই, কলই প্রভৃতি সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে বুড়াছা পূজিত। বুড়াছা একা নন। তাঁর স্ত্রী হলেন হাইচুকমা, দুই পুত্র হলেন যমপিরা ও কাল্‌পিরা

সৃষ্টিকর্তা প্রভু নিরঞ্জনের নিতম্ব থেকে উৎপন্ন হয়েছেন বুড়াছা। বাড়াছা হলেন নিরঞ্জনের সংহারী রূপ। তাঁর বাস হল বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে। তাঁর চুল, দাঁড়ি, গোঁফ সাদা, দেহ কদাকার ও পুঁতি গন্ধময় ভূত-প্রেত, নিয়ে তিনি শ্মশানে-মশানে ঘোরেন। স্বভাবে তিনি বড়ই কোপন, খল, বদমেজাজি। কিন্তু তিনি বনের পশু, পাখি কীট পতঙ্গের রক্ষাকর্তা। মানুষ কারণে-অকারণে বন্যপ্রাণী ধ্বংস করে ; তাই মানুষের উপর বুড়াছার বড়ই রাগ। সুযোগ পেলেই বন্যপ্রাণী ধ্বংসকারী মানুষকে শাস্তি দেন বুড়াছা, হাইচুকমা, যম্‌পিরা ও কাল্‌পিরা।

বুড়াছা প্রতিদিন পূজিত হন না। ভক্তদের ঘরের ভেতর বা দেবালয়ে তাঁর জন্য আসন নেই। বুড়াছাকে ভয় করে, ভক্তি করে দূরে রাখে, ঘরে আনে না কেউ। খল দেবতা রেগে গেলে বিপদ তাই দূর থেকে প্রণাম, বছরে অন্তত একবার বলিদান দিয়ে তুষ্ট রাখা। পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র-এই চার মাসের মধ্যে অনুষ্ঠেয় বারোয়ারি কের পূজায় বুড়াছা সপরিবার পূজা পান। মাথা পিছু একটি করে

চারটি মোরগ শাবক বলিদান করতে হয়। এছাড়া কারো কোন রোগ হলে, গৃহপালিত পশু হারালে, শিকারে যাতে বিফল না হয় সেজন্য বুড়াছা পূজিত হন। পূজা পাওয়ার জন্য এই চারজন অপদেবতা কোন কোন সময় গৃহপালিত শূকর, মোরগ, গরু বা মহিষকে লুকিয়ে রাখে এবং এদের দেহে রোগ সংক্রামিত করে।

মাইলুংমা ও খুলুংমা, দন্দক ও মন্দক

ধান ও কার্পাস-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী মাইলুংমা ও খুলুংমা এবং তাঁদের স্বামী ছন্দক ও মন্দক পূজা পান প্রতিদিন। ধনের দেবী হলেন মাইলুংমা, মাইলুংমার স্বামী হলেন দ্বন্দক। কার্পাসের দেবী হলেন খুলুংমা ; খুলুংমার স্বামী হলেন মন্দক।

ত্রিপুরার দক্ষিণ প্রান্তে বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত তুলসী পাহাড়ে বসবাসকারী খাকলু সম্প্রদায় ধানের দেবীকে মাইলুংমা এবং কার্পাসের দেবীকে খুলুংমা বলে ডাকে। রিয়াং সম্প্রদায় ধানের দেবীকে বলে মাইনুকমা এবং কার্পাসেরদেবীকে বলে খুনউকমা। দেববর্মা সম্প্রদায় বলে যথাক্রমে মাইলুমা ও খুলুমা।

মাইলুমা ও খুলুমা হলেন মৃদু, মধুর স্বভাবের, পরোপকারী দেবী। তাঁরা সারা বছর পূজিতা হন অতি সাধারণভাবে ; কিন্তু বছরে একবার আড়ম্বর করে পূজা করা হয়। বাসভবনের এককোণে, পবিত্র স্থানে এই দুই দেবীর প্রতীক সারা বছর যত্ন সহকারে রাখা থাকে। কাঠও বাঁশের তৈরি মাচা বানাতে হয়। মাচার উপর দু'টি মাটির পাতিল থাকে ; সেই দুটি পাতিলে চাল, কার্পাস, ছোট ছোট সুদৃশ শিলা, ফুল, দুর্বা, সিঁদুর ইত্যাদি রাখতে হয়। ধূপ, প্রদীপ দিতে হয়।

পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাস — এই চার মাসের মধ্যে সময় সুযোগ করে, চাঁদা তুলে গ্রামবাসীরা কের পূজা করে। সেই সময় বহু দেব-দেবীকে আরাধনা করা হয়। তখন মাইলুমা ও খুলুমা অবশ্যই পূজা পান। বার্ষিক বারোয়ারি পূজাতে বলিদান আবশ্যক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট মোরগ বলিদান করা হয়। চারজনের জন্য চারটি মোরগ শাবক বলিদান করা হয়।

মাই কছম মা

যাবতীয় শস্যবীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন মাই কছম মা। ধান, বেগুন, শসা, লংকা, কুমড়া, সরিষা, বরবটি, শিম, চিন্দ্রা. মার্মা, ট্যাড়শ, কাওন প্রভৃতি হল কৃষিজাত ফসল। এদের বীজ রক্ষা কৃষকের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এসব বীজের

অধিষ্ঠাত্রী দেবী মাই কছম মা পূজা পান মাইলুমা ও খুলুমা নামক দেবীদের সাথে।

ত্রিপুরার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী রিয়াং সম্প্রদায় মাইকছম মা নামক দেবীকে পূজা করে। মাই কছম মা হলেন মৃদু-মধুর স্বভাবের ও শান্ত প্রকৃতির, মঙ্গলকারী দেবী। ধান ও কার্পাস এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী মাইলুমা ও কুলুমা এর সহকারিণী দেবী। মাইলুমা ও খুলুমা এর প্রতীক নিত্য পূজিত হয় গৃহকোণে পবিত্রস্থানে। সাথে মাই কছম মা দেবী পূজা পান।

পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র — এই চার মাসের মধ্যে সময় সুযোগ করে চাঁদা তুলে গ্রামবাসীরা কের পূজা করে। বারোয়ারি পূজা। তাতে খল ও মঙ্গলময় এই উভয়বিধ দেবদেবী পূজা পান। মাই কছম মা দেবীও তখন পূজা পান। পূজার বিশেষ উপকরণ হল একটি মোরগ শাবক বলিদান।

লংতরাই মতাই ও শনিরাও মতাই

বন্য হাতি ও বাঘ — এর উপদ্রব থেকে পরিত্রাণ পেতে লংতরাই মতাই ও শনিরাও মতাই নামক দু'জন দেবতা পূজিত হন। বন্য হাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন লংতরাই মতাই ; বন্য বাঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন শনিরাও মতাই।

ত্রিপুরা দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উচই নামক সম্প্রদায় এই দুই দেবতাকে যথাক্রমে হাতির ও বাঘের দেবতা হিসাবে ভয় ও শ্রদ্ধা করে। দেববর্মা, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া ও রিয়াং সম্প্রদায় সমূহও এই দুই দেবতাকে ভয়-ভক্তি করে। খাকলু সম্প্রদায় গাজি কালু নামক পীরকে বাঘের দেবতা বলে মানে। ত্রিপুরার বাঙালি সমাজে বাঘাই নামক উপদেবতাকে মানে।

ত্রিপুরার বন-জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে অসংখ্য হাতি ও বাঘ থাকত। এই হাতি পাওয়ার জন্য তুর্কি, আফগান, মোগলরা ত্রিপুরাকে বহুবার আক্রমণ করেছিল। বন্য হাতি ও বাঘের উপদ্রব ত্রিপুরাতে সাংঘাতিক ছিল। ১৯৫০ সালেও আগরতলাতে নাগরিকরা হাতির ভয়ে ভীত থাকত। সুতরাং পাহাড়ে বসবাসকারীদের কাছে হাতি ও বাঘের ভয় ছিল অত্যন্ত বেশি।

এই দুই দেবতাকে বাড়িতে, গৃহকোণে স্থান দেওয়া যায় না। নিত্য পূজা দেওয়া হয় না। কিন্তু যেহেতু জনজাতিদের জীবনও জীবিকা বন কেন্দ্রিক, তাই হিংস্র বন্য জন্তুর অধীশ্বরদ্বয়কে পূজা দিতে হয়।

লাম্প্রা

উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে, বিবাহে, শ্মশানে প্রকৃত বান্ধবরূপে আশীর্বাদ, আশ্বাস ও অভয় দেন লাম্প্রানামক দেবতা।

ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্র বসবাসকারী নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং, কলই, খাকলু, উচাই প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কয়েক লক্ষ লোক লাম্প্রা দেবতাকে ভক্তিভরে পূজা দেয়। এক অর্থে লাম্প্রা মানে দুই রাস্তার মিলনস্থল, অর্থাৎ দোমোহনি। অন্য অর্থে, দুই জন দেবতার সম্মিলিত নাম হল লাম্প্রা। নারী ও পুরুষের বিবাহ। এই উপলক্ষে লাম্প্রা দেবতার পূজা তাৎপর্যপূর্ণ। লাম্প্রা শব্দের অন্তরালে যে-দুইজন দেবতা আছেন, তাঁদের নাম সম্প্রদায় - ভেদে সামান্য ভিন্ন। ত্রিপুরার বৃহৎ জনগোষ্ঠী হল দেববর্মা। দেববর্মা সম্প্রদায় এই দুই দেবতাকে বলে আখাত্রা ও বিখাত্রা। রিয়াং সম্প্রদায় বলে আখিত্রা ও বিখিত্রা। খাকলু সম্প্রদায় বলে সুকুন্দ্রাই ও মুকুন্দ্রাই।

লাম্প্রা হলেন অত্যন্ত পরোপকারী, মাঙ্গলিক দেবতা। স্বভাবে, শান্ত, মেজাজে মধুর, মনের দিক্ থেকে তরুণ যুবক হলেন এই দেবতা। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, বিবাহ উপলক্ষে লাম্প্রা পূজা অত্যাবশ্যক। বিগদ ভঞ্জন মধুসূদন স্বরূপ হলেন লাম্প্রা। তাই রোগ শোক যাতে পাড়াতে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য অন্য কোথাও কোন মহামারী রোগের খবর পেলেই, লাম্প্রা পূজা দিতে হয়। এর নাম লাম্প্রা ওয়াথপ। আবার যদি মুখদোষ জনিত উপদ্রবে কেউ কষ্টপায়, কারো ফসল নষ্ট হয় বা হতে পারে, তখন যে লাম্প্রা পূজা দেয় তার নাম লাম্প্রা খোয়াখিবিমান।

লেক্ষীতেই, আইনু

ধানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লেক্ষীতেই এবং তুলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আইনু পূজিতা হন কৃষিকাজের মঙ্গলার্থে।

ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান জনজাতি হল হালাম। হালাম-এর অন্তর্গত অন্যতম গোষ্ঠী হল মলসম। মরছুম নামেও এই গোষ্ঠী পরিচিত। এই গোষ্ঠীর উপাস্য দেবী হলেন লেক্ষীতেই ও আইনু। লেক্ষীতেই হলেন আসলে লক্ষ্মীদেবী। দেববর্মা সম্প্রদায় ধানের দেবীকে বলে মাইলুমা এবং কার্পাসের দেবীকে বলে খুলুমা ; রিয়াং সম্প্রদায় বলে মাইনুকমা এবং খুনউকমা।

লেক্ষীতেই ও আইনু মঙ্গলকারী, শান্তস্বভাবের দেবী। বাড়ির ভেতরে,

গৃহকোণে তাঁদের আসন থাকে। দু'টি মাটির পাতিলে ধান, চাউল, কার্পাস, সিঁদুর, ধূপ, প্রদীপ, ইত্যাদি দিয়ে রাখে ভক্তরা। প্রতিদিন যৎসামান্য পূজা দেওয়া হয়। কিন্তু বার্ষিক বারোয়ারি পূজায় তাঁদের পূজা দিতেই হবে।

শিশি

শরীরে কাটা ঘা, ক্ষতস্থান প্রভৃতির উপদ্রব হলে দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য শিশি নামক এক অপদেবতার পূজা দেওয়া হয়।

ত্রিপুরার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে এবং কাছাকাছি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী নোয়াতিয়া এবং উচই নামক সম্প্রদায়ে এই দেবতার পূজার প্রচলন রয়েছে।

উচই সম্প্রদায় বলে শিশি। নোয়াতিয়া সম্প্রদায় বলে শিশি মাংজি। শিশি ভূত-প্রেতজাতীয় অনিষ্ঠকারী, খল প্রকৃতির, চঞ্চল স্বভাবের অপদেবতা। বুড়াছা ও হাইচুকমা নামক খল প্রকৃতির দেব-দেবীর আজ্ঞাবহ এবং নিত্য সহচর হলেন শিশি। এই শিশি এতই পাজি যে, কোথাও কারো শরীরে ক্ষতস্থান, কাটা ঘা, ফোঁড়া ইত্যাদি দেখলেই অমনি ঐ ব্যাক্তির দেহে প্রবেশ করে রক্তপাত করায়।

পরিশিষ্ট

ককবরক ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা ও প্রসারে সম্ভাব্য গ্রহণযোগ্য কর্মসূচি।

বিষয়

১) ক) ককবরকভাষী জনগোষ্ঠীদের (ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং নোয়াতিয়া, রূপিনী, কলই, উচই, মুরাসিং) বিরহ সঙ্গীত, প্রেম সঙ্গীত, বিবাহ সঙ্গীত, জুম সঙ্গীত।

খ) ককবরক ভাষীদের নৃত্যাবলী

গ) নাটক বা যাত্রাপালা (জমাতিয়াদের)

ঘ) লোককথা, রূপকথা কিংবদন্তী (কেরেং কথমা)

ঙ) সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব ও মেলা প্রভৃতি

চ) জাদু ও মন্ত্রতন্ত্র

ছ) দেব দেবী

জ) বাঁশ ও বেতজাত হস্তশিল্প ও বয়নশিল্প

ঝ) অচাই বা বৈদ্যদের চিকিৎসা পদ্ধতি

ঙ) ছড়া ধাঁধা প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদি

২। **ককবরক সংস্কৃতির উপকরণ কিভাবে সংগ্রহ করা হবে ঃ**

ক) শব্দগ্রাহক যন্ত্র অর্থাৎ টেপরেকর্ডার মাধ্যমে

খ) আলোকচিত্রের যন্ত্র বা ক্যামেরার সাহায্যে

গ) কাগজ ও কলমের সাহায্যে

ঘ) দলগত অথবা একক ভাবে সার্ভের মাধ্যমে

ঙ) লোকসঙ্গীত ও লোক শিল্পের বিবরণ সংগ্রহ করে প্রয়োজনবোধে টেপরেকর্ডে ধরে রেখে — লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ককবরক ভাষীদের সংস্কৃতি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ঃ

ক) লোক সংস্কৃতি বিষয় সংগ্রহ করে

খ) বিষয়গুলির অঞ্চল ও সম্প্রদায়ভেদে পার্থক্য ও রূপপরিবর্তন কিভাবে ঘটছে তার বর্ণনার মাধ্যমে।

গ) সংগ্রহের জন্য প্রত্যক্ষ সমীক্ষাই (Field study) উত্তম ব্যবস্থা

ঘ) পূজাপার্বণ নৃত্যাদি বিষয়ে অনেকে ভুল তথ্য সরবরাহ করে থাকেন। সেগুলি সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করে সংশোধন করা।

ঙ) সংগৃহীত মালমশলা প্রথমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করে বিশ্লেষণের কাজে হাত দেওয়া। এ কাজটি অভিজ্ঞ লোকদের সাহায্য গ্রহণ করা।

চ) সামাজিক অর্থনৈতিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে যথাযথ বিশ্লেষণ করা।

৩। **ককবরক শব্দভাণ্ডার সংগ্রহের পদ্ধতি ঃ**

যে আটটি সম্প্রদায় ককবরক ভাষায় কথা বলে তাদের সম্প্রদায়ভেদে বা এলাকাভেদে শব্দগত ধাতুগত পার্থক্য রয়ে গেছে এবং থাকা স্বাভাবিক। বাংলা ভাষার মত সমৃদ্ধতম ভাষার দিকে চোখ ফেরালেই আমরা দেখি আঞ্চলিক পার্থক্য কত বৈচিত্রময়। ককবরক ভাষা ক্ষুদ্র অঞ্চলের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীদের ভাষা হলেও এর বৈচিত্র্য কম নয় —বলা বাহুল্য এই বৈচিত্র্যময় শব্দ ভাণ্ডারই একটি ভাষার বিচিত্র ভাব প্রকাশের ও ভাব বহন করার শক্তি সঞ্চয় করে থাকে।

বর্তমান ককবরক শব্দ ভাণ্ডারে যে পরিমাণে শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে শক্তিশালী সাহিত্য সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট নয় — তাই শব্দ ভাণ্ডারকে অধিকতর সমৃদ্ধ করতে হবে — প্রসারিত করতে হবে। তার জন্য দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন ঃ—

১) বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি শব্দ ভাণ্ডার থেকে আহরণ করে ককবরক শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োগ করতে হবে। এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য যে ককবরক ভাষার শব্দ ভাণ্ডার অত্যন্ত সীমিত তাই সমৃদ্ধ ভাব ও ভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনুবাদ করা একেবারেই অসম্ভব। তাই আজকাল ককবরক অনুবাদকগণ অনেক সময় বাংলা থেকে ককবরক অনুবাদ করতে গিয়ে, শুধুমাত্র

আক্ষরিক অনুবাদে এমন একটি অর্থ হয়ে দাঁড়ায় যার না ঘরকা না ঘাটকা কিসিমের এক কিম্ভূত কিমাকার দশা। এতে ককবরক সমৃদ্ধ তো হবেই না বরং একটা হাস্যকর ভাষায় পরিণত হতে চলেছে — আকাশবাণীর ককবরক সংবাদ - অনুবাদ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ককবরক ভাষাভাষী সমাজে প্রচলিত লোকসংস্কৃতির কিছু উপাদান ঃ

১) লোক কাহিনি পৌরাণিক কাহিনি, ও ঐতিহাসিক কাহিনী

২) গ্রামের নাম ও নদীর নামের সামাজিক ও লৌকিক কাহিনী

৩) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বিশ্বাস ও কিংবদন্তী

৪) লোক নৃত্য — গড়িয়া, হজাগিরি, মাইমিতা ও মশক

৫) লোকনাট্য বিশেষত জমাতিয়াদের যাত্রাপালা

৬) ছড়া, ধাঁধা লোকপ্রবাদ সংস্কার

৭) পূজা পার্বণ ও মেলা (সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব)

৮) লোকশিল্প, বাদ্যযন্ত্র, বেত ও বাঁশ কাঠের কাজ ও বয়নশিল্প

৯) লোকভাষা ও শব্দ

ককবরকভাষী আটটি সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত শব্দ ভাণ্ডার সংগ্রহ করে একখানি শব্দ কোষ গ্রন্থ রচনা করতে হবে। প্রবাদ ও প্রচলন শব্দ সংগ্রহ করে তুলনামূলক আলোচনা করতে হবে। গ্রাম ও নদীর নাম, লোক চিকিৎসা, লোক বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয় সংগ্রহ করে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করতে হবে।